গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১১ - ১৭ নভেম্বর, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

তেল কোম্পানিগুলির ক্ষতির গল্প ফাঁস

তেল কোম্পানিগুলি মুখের কথা খসাতে না খসাতেই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার, ৩ নভেম্বর মধ্য রাত থেকে পেট্রলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। মন্ত্রী বলছেন, এই দামবৃদ্ধিতে সরকারের হাত নেই, তেল কোম্পানিগুলির সিদ্ধান্ত এটা। এও আর এক মিথ্যাচার। বাস্তবে তেল কোম্পানিগুলির মালিক সরকার নিজেই, ফলে দামবৃদ্ধি যে সরকারের অঙ্গুলিহেলনেই হয় তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। কাজেই প্রণববাবু বা মনমোহন সিং যতই বলুন যে, দাম বাড়িয়েছে তেল কোম্পানিগুলি, সেই শিশুসুলভ যুক্তিতে মানুষকে ভোলানো যাবে না।

৪ নভেম্বর । কলকাতায় বিক্ষোভ

সেই সাথে ইতিমধ্যেই প্রকাশ, কোম্পানিগুলি চাইছে ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম যথাক্রমে লিটার প্রতি অন্তত ৩ টাকা ও সিলিণ্ডার প্রতি অন্তত ৫০ থেকে ৭৫ টাকা বাড়াতে। গরিব মানুষের নিত্যব্যবহার্য কেরোসিন তেলের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবও এসে গিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির চাপে জর্জরিত সাধারণ মানুষের যখন নাভিশ্বাস উঠছে এবং প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত কংগ্রেস নেতারা জাঁক করে যখন বলে চলেছেন যে বিশ্বমন্দার বাজারেও ভারতের অর্থনীতি মজবুত আছে, ঠিক তখনই এই মূল্যবৃদ্ধি আবারও ভারতীয় পুঁজিবাদের প্রবল সংকটকেই দেখিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্র এখন এই সংকটের বোঝা দেশের জনগণের ওপর চাপাতে ব্যগ্র।

বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়েনি, তাই এবার সরকারি মিথ্যাচারের কৌশল বদলাতে হয়েছে। তারা বলছে ডলারের তুলনায় টাকার দাম কমে যাওয়ায় তেল কোম্পানিগুলির নাকি দৈনিক ৩৩৩ কোটি টাকা করে লোকসান হচ্ছে। যদিও কোনও তেল কোম্পানিরই বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্টে লোকসান নেই। তাদের মুনাফার পরিমাণ হাজার হাজার কোটি টাকা। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের ২০১০ সালের লাভ সঙ্গের তালিকা দেওয়া হল।

২০১০ সালে তেল কোম্পানির লাভ

ইন্ডিয়ান অয়েল	১০,৭১,৭১৩ কোটি টাকা
রিলায়েন্স	১৫,৮৯৮ কোটি টাকা
ও এন জি সি	১৯,৪০৩ কোটি টাকা
বি পি	১,৬৩২ কোটি টাকা
এইচ পি	১,৪৭৫ কোটি টাকা

তথ্য সূত্র ঃ www.daytradingshare.com

অথচ তারা লোকসানের মিথ্যা গাওনা গাইছে। আর তাতে তাল দিচ্ছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার।

এর আগে বারবার আমরা তথ্য দিয়ে দেখিয়েছি, বিশ্ববাজারে তেলের দামবৃদ্ধি বা তেল কোম্পানিগুলির লোকসানের গল্প নেহাতই অজুহাত; আসলে তেলের দাম বাড়িয়ে তার থেকে কর বাবদ বেশি টাকা তুলে ঘাটতি মেটানোই সরকারের লক্ষ্য।

তেলের দাম বাড়াতে পারলেই কর বাবদ সরকারের আয় বাড়ে। আর পেট্রলের ওপর করের ভার যেহেতু দামের অর্ধেকেরও বেশি তাই আয়বৃদ্ধির হারটাও বিশাল। প্রতি লিটার পেট্রলে কেন্দ্রীয় সরকারের করের ভাগ ১৪ টাকা ৭৮ পয়সা এবং রাজ্যের কর ১৫ টাকা ১৩ পয়সা। কর বাদ দিলে তেলের দাম ৪১ টাকা ৭৪ পয়সা। সেই

ছয়ের পাতায় দেখুন

শ্রদ্ধায় স্মরণে নভেম্বর বিপ্লব

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৯৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে ৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রক্তপতাকা উত্তোলনের পর নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিনের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর।

৪ নভেম্বর । পাটনায় বিক্ষোভ

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

সিপিএমের দেখানো পথে শিক্ষা-সংহারে উদ্যত রাজ্য সরকার

সিপিএম সরকারের দেখানো পথে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। সিপিএম সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার পাশাপাশি পাশ-ফেলও তুলে দিয়েছিল। জনসাধারণের প্রত্যাশা ছিল নতুন সরকার পুনরায় চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু করবে। তা তো তারা করলই না, উপরন্তু আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিল। সরকারের এই ভূমিকায় রাজ্যের মানুষ বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধও। তাঁদের প্রশ্ন, সিপিএম সরকারের শিক্ষানীতির মারাত্মক পরিণতির কথা জানা সত্ত্বেও তৃণমূল সরকার এমন একটি সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নিল কেন? এ প্রশ্নের কোনও উত্তর শিক্ষামন্ত্রী দেননি। তিনি বলেছেন, ''এর উত্তর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জেনে নিন।''

সিপিএম সরকারের প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফল কী মারাত্মক হয়েছে রাজ্যের মানুষ তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার সর্বনাশ হয়েছে, শিক্ষার ভিতটাই ধসে গিয়েছে। কয়েক প্রজন্ম ধরে সাধারণ পরিবারের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এর মাশুল দিয়ে চলেছে। দেখা গেছে, বিরাট অংশের ছাত্রছাত্রী প্রাথমিকে প্রায় কিছুই শেখেনি। পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে যোগ-বিয়োগ করতে পারছে না। অনেকে বাংলা পড়তে পারে না।

৪ নভেম্বর কলকাতায় এ আই ডি এস ও'র বিক্ষোভ

এমনও দেখা গেছে যে, নিজের নাম পর্যন্ত ঠিকমতো লিখতে শেখেনি। স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাথমিক স্তরে প্রায় কিছুই না শেখা এই ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী ক্লাসে এঁটে উঠতে পারেনি, ছিটকে গিয়ে স্কুল-ছুটের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষ, অনেকে তাঁদের সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও বেসরকারি স্কুলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে একদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বেসরকারি স্কুল। যা কার্যত প্রাথমিক শিক্ষাকে বেসরকারি মুনাফার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। বিরাট সংখ্যক অভিভাবক এই শিক্ষা-ব্যবসায়ী বেসরকারি স্কুল মালিকদের মুনাফার খাঁই মেটাতে গিয়ে দিশেহারা হয়েছেন, তেমনই বাংলা মাধ্যম সরকারি স্কুলগুলির মানও ক্রমাগত অধঃপতিত হয়েছে। ছাত্রের অভাবে বহু স্কুল উঠে গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার সর্বনাশের এমন জলজ্যান্ত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই রকম সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নিল

পাঁচের পাতায় দেখুন

অর্ডিন্যান্স-এর প্রতিবাদ জানাল এ আই ডি এস ও

রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দলতন্ত্রমুক্ত করার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সংস্থা ভেঙে দিতে চলেছে। রাজ্যপালের স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এর অনুমোদনও মিলেছে। এই অগণতান্ত্রিক অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে ৩ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের গেটে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এখানে অর্ডিন্যান্সের কপিতে অগ্নিসংযোগ করেন এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ কমরেড অংশুমান রায় এবং বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ইমতিয়াজ আলম। তিনি বলেন, সংবাদ মাধ্যম থেকে যতটুকু জানা যাচ্ছে, পুনর্গঠিত এই পরিচালন পর্ষদে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে না। পরিচালন সংস্থাগুলি গঠিত হবে রাজ্য সরকারও ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে। তিনি বলেন, এই অর্ডিন্যান্স বাতিল না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

আন্দোলনে পার্ট টাইম শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা

বর্তমানে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত অধিকাংশ স্কুলে অল্পসংখ্যক স্থায়ী শিক্ষকের পাশাপাশি হাজার হাজার পার্ট টাইম শিক্ষক কর্মরত। রয়েছেন বহু পার্টটাইম শিক্ষাকর্মীও। এঁদের ওপরই স্কুলের পঠনপাঠন ও অন্যান্য যাবতীয় কাজের বেশিরভাগটাই নির্ভর করে। অথচ সরকারি খামখেয়ালিপনায় এঁরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন, অনেককেই অন্যায়ভাবে কর্মচ্যুত করার দাবিতে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা সহস্রাধিক আংশিক সময়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পার্টটাইম স্কুল টিচার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে ৩ নভেম্বর শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেন। তিনি প্রতিনিধিদের চাকরির স্থায়ীত্বের আশ্বাস দিয়ে বলেন, অন্যান্য বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন। বিকাশ ভবনের সামনে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের

করা হচ্ছে। অধিকাংশ শিক্ষকই বেতন পাচ্ছেন ৫০০ বা ১০০০ টাকা।

পার্ট টাইম শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্বীকৃতি, মর্যাদা, স্থায়ীকরণ, সরকার কর্তৃক সকলের আর্থিক দায়ভার গ্রহণ, কন্ট্রোল অব এক্সপেন্ডিচার অ্যাক্ট ২০০৫ বাতিল ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কর্মচ্যুত না অবস্থানে সংহতি জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন কলেজ পার্ট টাইম শিক্ষক সংগঠনের সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেবনাথ, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক রতন লস্কর, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নারী নির্যাতন, মাদক ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ অবস্থান

রাজ্যের ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন-খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদে ২ নভেম্বর সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন এবং অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলার বটতলায় চার ঘণ্টার গণঅবস্থান পালন করা হয়। বক্তব্য রাখেন এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদিকা কমরেড শিবানী দাস, এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী, এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মৃদুলকান্তি সরকার। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে পণের জন্য বধূহত্যা, বধূ নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন অহরহ ঘটে চলেছে, যদিও সিপিএম পরিচালিত একটি বামপন্থী নামধারী সরকার ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন। পাড়ায় পাড়ায় নারীদেহ এবং মদের অবৈধ ব্যবসার রমরমা। পুলিশ, প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তার জন্য এসব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনার সাথে জড়িতরা শাসক দলের সমর্থক হওয়ায় পার পেয়ে যাচ্ছে। সাইবার কাফে থেকে নারীদেহের অশ্লীল প্রদর্শনী আজ তরুণ যুবকদের মোবাইলে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ রাজ্যে নারীদের জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নেই। এর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল স্তরের জনসাধারণের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

নিউটাউনে কিশোরী হত্যার প্রতিবাদে এ আই এম এস এস-এর থানা ঘেরাও

২৮ অক্টোবর নিউটাউন থানা এলাকার গোবিন্দ নগরে ১৩ বছরের বিপাশা মাজিকে স্থানীয় এক যুবক ধর্ষণ করে হত্যার উদ্দেশ্যে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়। প্রমাণ লোপাটের জন্য মৃতপ্রায় মেয়েটিকে নিয়ে পালাতে গেলে পাড়ার লোকেদের নজরে বিষয়টি আসে। ঐ দিনই মেয়েটির মৃত্যুর খবর পেয়ে এ আই এম এস এস আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধিরা তার বাড়িতে যান। ৩ নভেম্বর এলাকার শতাধিক মহিলা ও পুরুষ এম এস এসের নেতৃত্বে থানা ঘেরাও করেন। প্রায় দু'ঘন্টা ঘেরাও করার পর ওসি দোষীদের কঠোর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিলে থানা ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কলকাতা জেলা কমিটির সভানেত্রী কমরেড ভারতী রায় এবং কমরেডস অতসী মুখার্জী, সন্ধ্যা দিন্দা, মীনাক্ষি কর্মকার, কৌশল্যা মণ্ডল।

'ফর্মুলা ওয়ান' স্বপ্নপূরণ করল কাদের

বিশ্বের 'রিচেস্ট স্পোর্টস শো' ফর্মুলা ওয়ান প্রথমবারের জন্য দৌড়ালো ভারতে — 'চাষার ভারতে', চাষের জমিতে বানানো বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে স্বপ্নপূরণ হল, আমাদের নাকি সুব্রত রায় - বিজয় মালিয়াদের? গর্বে উত্তেজনায় মাতাল মিডিয়া। একদল উৎসবের মেজাজে। অন্যদল যাদের আপ্লুত হওয়ার কথা ছিল সবচেয়ে বেশি, কারণ তাদের জমিতেই আজ ইতিহাস খেলা করছে — তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।

প্রায় সাড়ে সাতশ একর জমিতে দু'হাজার কোটি টাকা খরচ করে বানানো হয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ বৈভব ও উত্তেজনাময় খেলার মঞ্চটি। ১৭০টি দেশে লাইভ দেখা গেল সুটিল, শুয়াখারদের রেস। দেশের তাবড় সেলিব্রিটি নেতামন্ত্রীরা টিভির পর্দায় চোখ রেখে জনম 'সার্থক' করলেন। আকাশচুম্বী যখন আয়োজন, তখন জমিহারা কতগুলো গরিব চাষার বিক্ষোভ ও আত্মহত্যাকে ততটা পাত্তা না দিলেও চলে! জনগণ জাহান্নামে যাক, জনগণের ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকায় নিজের মূর্তি বানানো মায়াবতীর বুদ্ধিতে 'বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে'র খেলা থেকে ট্যাক্স নেওয়াটা নেহাতই ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। পুঁজিপতিদের সেবা করাটাই যেখানে সরকারি ধর্ম সেখানে, উত্তরপ্রদেশ সরকার সেই ধর্মরক্ষা করেছে মাত্র। আর, সরকার যাদের রক্ষা করতে পারল না, সেই জনগণ দেখল, তাদের পথে বসিয়ে 'সাহারা ফোর্স ইন্ডিয়া' প্রতি ঘণ্টায় দৌড়ালো তার সর্বোচ্চ গতি ৩২০ কিমি, আর আত্মহত্যা করল ১৫ জন ভোটার! কতজন ধর্ষিত হল? কত জন কাজ হারাল? কত জন খুন হল? কত জন পাগল-ভিখিরি হয়ে গেল? — ইন্টারনেট সার্চ করুন, ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো প্রদত্ত তথ্য হয়তো পেয়ে যাবেন।

নেট সার্চ না করেই যে ভারতবর্ষ গ্লোবালাইজেশনের শ্রেষ্ঠ গন্তব্য, যে ভারতবর্ষ বুঝলই না, — 'ফর্মুলা ওয়ান' খায় না মাথায় মাখে! কাঁঠালটি যথারীতি ভাঙা হল সেই রুগ্ন, পঙ্গু, না খাওয়া ভারতবর্ষের মাথাতেই। আর এদিকে শিক্ষিত বেকারে ছেয়ে ভারত, শিকে ছিঁড়েছে ভেবে নিজেকে আপ-টু-ডেট করেছে, একটা এফ ওয়ান টিম চালানোর বার্ষিক খরচ ১২০ থেকে ৪৮০ মিলিয়ন ডলার। 'আই পি এলের চিয়ার গার্লস এবং নৈশ জীবনকে গুণে গুণে দশ গোল দেবে এফ ওয়ানের গ্রিড গার্লস এবং নৈশ জীবন। রিয়ালিটি শো-র মাধ্যমে গ্রিড গার্লস হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে দেশের ৪৮ জন সুন্দরীকে। যারা ড্রাইভারদের ট্রাকে তো নিয়ে যাবেনই, রেস শেষে পুরস্কার বিতরণীতে শ্যাম্পেনের বোতল খুলবেন। বাছাই করারা থাকবেন প্যাডক ক্লাব মানে ভিআইপি এনক্লোজারে। আর রাতের আফটার রেস পার্টি?

আফটার রেস পার্টিতে যখন দেশের কয়েকশো শিল্পপতি সেলিব্রিটি নেতামন্ত্রী মত্ত, তখন দেশের একশো কোটি জনতার রাতটা কীভাবে কাটল? ফুটপাথে শুয়ে, একটু ছাদের জন্য কাড়াকাড়ি করে? কার খাওয়া জুটলো, কার জুটলো না? কে চাকরি পেল, কে হারল? কে ঘরে, কে ফুটপাতে? আফটার রেস পার্টি কতজন সূর্যোদয় দেখল, আর কতজন গাড়ি চাপা পড়ল? এক দীর্ঘ প্রশ্নমালার সমান্তরাল দাঁড়িয়ে স্মার্টলি উত্তর আসবে 'নো পলিটিক্স প্লিজ'। এ নিয়ে রাজনীতি করবে না, নাকি মিডিয়ার মাতলামিতে মাদল না বাজিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনে অংশ নেওয়া জনতার মতোই আওয়াজ তুলবে — 'উই আর মেনি, দে আর ফিউ' —আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, ওরা সংখ্যালঘু, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠরা বঞ্চিত। আমরা খাদ্য চাই, কাজ চাই, স্বাস্থ্য চাই, শিক্ষা চাই।

উত্তর দিনাজপুর

রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলা জুড়ে আন্দোলন

উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে রেশন ব্যবস্থায় চলছে চরম দুর্নীতি। গরিব মানুষ তাদের বিপিএল, অন্ত্যোদয়, অন্নপূর্ণা কার্ড প্রতি সরকার নির্ধারিত প্রাপ্য চাল গম, আটা, চিনি, কেরোসিন তেল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকার নির্ধারিত দাম থেকে অনেক বেশি দাম নেওয়া হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার বিপিএল এবং অন্ত্যোদয় কার্ডধারীদের যে অতিরিক্ত চাল, আটা গত জুলাই মাস থেকে বরাদ্দ করেছে তার পুরোটাই বেশির ভাগ ডিলার আত্মসাৎ করেছেন। খাদ্য দপ্তরের কিছু অসাধু অফিসারের সঙ্গে একশ্রেণীর দালাল চক্রের যোগসাজসে নতুন কার্ড করতে আসা গরিব মানুষের কাছ থেকে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অনেকে খাদ্য দপ্তরের অফিসে এসে দিনের পর দিন ঘুরেও কার্ড পাচ্ছেন না। এসবের বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে ডিলার ঘেরাও, খাদ্য দপ্তরের অফিসে ডেপুটেশন, ঘেরাও, রাস্তা অবরোধের মাধ্যমে আন্দোলন চলছে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। দলমত নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ এস ইউ সি আই (সি) প্রভাবিত সংগ্রামী গণমঞ্চের পতাকাতলে এসে যুক্ত হচ্ছেন। আন্দোলন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। আন্দোলনের চাপে জেলার বেশ কিছু ডিলার সাসপেন্ড হয়েছেন। গরিব মানুষের ঐক্য ভেঙে গণআন্দোলনকে কোনওভাবে স্তব্ধ করতে না পেরে আন্দোলনের নেতাদের উপর মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ডিলারদের এই দুর্নীতি, খাদ্যদপ্তরের অফিসারদের একাংশের সঙ্গে ডিলারদের অশুভ আঁতাত বন্ধ করতে এবং আন্দোলনকারীদের ওপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ২৪ অক্টোবর উত্তর দিনাজপুর জেলাশাসকের নিকট গণবিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। জেলা শাসক অসুস্থ থাকায় সহকারী জেলাশাসক ডেপুটেশন গ্রহণ করে দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং দাবি পূরণে কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেন।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস সনাতন দত্ত, জ্যোতির্ময় বর্মন, ফণী সিংহ, মোজাম্মেল হক, মামনুর হুসেন, সুরেশ চক্রবর্তী, শামীম আখতার, কেশোরী বর্মন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমসোমল শিবির

প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২২-২৩ অক্টোবর কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন কমসোমলের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শিবির অনুষ্ঠিত হয় নারায়ণগড় উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৫৭ জন প্রতিনিধি এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরের সূচনা করেন এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি। জেলা শিবিরে পিটি, প্যারেড, ফুটবল ও অন্যান্য খেলাধূলা হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, আবৃত্তি ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা পরিবেশন করে প্রতিনিধিরা। এছাড়া মনীষীদের ও বিপ্লবীদের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়েও কমসোমলের সদস্যরা আলোচনা করে। জেলাশিবিরে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কমসোমলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড চিত্রিতা ব্যানার্জী। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে জেলা শিবির শেষ হয়।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ‘ফিরিয়ে আনার’ অধিকার প্রসঙ্গে

প্রতিনিধি নির্বাচিত করার মতই ফিরিয়ে আনার অধিকার ভোটারদের থাকবে এই ন্যায়সঙ্গত অধিকার (রাইট টু রিকল) জনগণের হাতে থাকা সমীচীন কিনা এনিয়ে আবার নতুন করে দেশের বিভিন্ন মহলে আলোচনা উঠেছে। সম্প্রতি দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের প্রতি মানুষের প্রবল জনসমর্থন দেখে আন্না হাজারে এই দাবি নিয়ে নতুন করে আন্দোলনের কথা বলার পরেই বর্তমান আলোচনা ও বিতর্কের সূত্রপাত। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি সহ সর্বব্যাপক সংকটে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা দুর্বিষহ বললেও কিছুই বোঝানো যায় না। দেশের সরকারি ক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক দলগুলির ছোট-বড় নেতাদের মধুর বচন, প্রতিশ্রুতির ডালি কোনও কিছু দিয়েই এই সর্বগ্রাসী সংকটকে ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। সাম্প্রতিক দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে জনজোয়ারের মধ্য দিয়ে মানুষের এই সম্মিলিত ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দেশের কর্ণধার, কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিভিন্ন দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ যে ফেটে পড়তে চাইছে তা বুঝেই শ্রীহাজারে এই আন্দোলনের কথা তুলেছেন। গান্ধিবাদী ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী চলার ফলে শ্রীহাজারে মনে করেছেন এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীকে বদলে দিলেই বোধহয় দুর্নীতি দূর হবে, মানুষের দুর্দশা কমবে। পুঁজিবাদী শোষণ-লুটের আগুনে দগ্ধ মানুষও একটু সুরাহার আশায় তাঁর আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

‘রাইট টু রিকল’ বলতে বোঝায় কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে বা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে, তাঁর নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের তিন চতুর্থাংশ বা আইনগতভাবে নির্দিষ্ট শতাংশের ভোটার সই করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির প্রতি অনাস্থা জানালে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। দেখা যাচ্ছে, দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি থেকে শুরু করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পর্যন্ত প্রায় সকলেই ‘রাইট টু রিকল’ এবং ‘রাইট টু রিজেক্ট’ (কোন প্রার্থীই পছন্দ নয় এই মত প্রকাশের অধিকার) এর বিরোধিতা করেছেন।

এবারের বিতর্ক দেখে মনে হতে পারে যে এই বোধহয় প্রথম ‘রাইট টু রিকল’ এর কথা উঠল। ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকেই মানুষের হাতে এই অধিকার দেওয়ার দাবি জানিয়ে এসেছে। এমনকী ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে দু’দফায় যখন পশ্চিমবঙ্গে আমাদের দল যুক্তফ্রন্টের গুরুত্বপূর্ণ শরিক হিসাবে সরকারে অংশগ্রহণ করেছে, সেই সময়েও প্রাক নির্বাচনী বক্তব্যে এবং জেতার পর যখনই সম্ভব হয়েছে তখনই ‘রাইট টু রিকল’ এর অধিকার মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত দাবি জানিয়েছে। অতি সম্প্রতি ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও এই দাবিটিকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তুলেছি। সংবাদমাধ্যম চোখ বুজে থাকার ভান করলেও এই লাগাতার প্রচেষ্টার একটা প্রভাবও জনমানসে বিরাজ করছে।

আমরা এই ‘রাইট টু রিকল’কে এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে মানুষের সামনে এনেছি কেন? অনেক এম পি, এম এল এ নিয়ে মসনদ আলো করে বসে থাকা ছোটবড় সংসদীয় দলগুলি অস্বীকার করতে পারে না যে, আজকের দিনে যারা ভোটে জিতে সাংসদ, বিধায়ক, পঞ্চায়েত প্রধান, কিংবা কাউন্সিলর হন — খাতায় কলমে যত গালভরা নামই হোক না কেন, জনগণ তাদের নিজেদের প্রতিনিধি মনে করে না। জনগণ এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো মনে করে যে, একবার জিততে পারলেই তথাকথিত জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের প্রাক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অবধারিতভাবে ভুলে যাবেন। তাঁরা থাকবেন জনগণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আরাম-আয়েস, যথেচ্ছ দুর্নীতি, জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে একটার পর একটা আইন প্রণয়ন, কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে জনস্বার্থকে দু’পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া — এসবে জনপ্রতিনিধি যত দক্ষ হয়ে ওঠেন তত বেশি করে সংবাদমাধ্যম তাঁর প্রচার দেয়। তাঁর জয়ের পথ সুগম করার জন্য টাকার থলি নিয়ে মালিকরা পাশে এসে দাঁড়ায়। একথা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, ভোটে জেতার জন্য জনসমর্থনের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল টাকা, প্রচারমাধ্যম, বাহুবলের শক্তি, ইংরেজিতে যাকে বলে মানি-মিডিয়া-মাসল পাওয়ার।

ভোট হয় কীভাবে এ আমাদের সকলেরই কম বেশি জানা। ভোটের বাজারে নেতারা যখন হাসিমুখে জোড় হস্তে দরজায় দরজায় ভোট ভিক্ষা করে বেড়ান, তাঁদের কাছে পেয়ে গণতন্ত্রের মহিমায় কৃতার্থ জনগণও জানেন খবরের কাগজের পাতা কিংবা টিভির পর্দার বাইরে এই মুখটি দেখতে তাঁদের আবার পাঁচটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। ভোট বাজারে আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় একটি কথা ‘ভোট মেশিনারি’। অর্থাৎ যেনতেন প্রকারে ভোট ম্যানেজ করবার ব্যবস্থাপনা। অসংখ্য প্রতিশ্রুতি, ভোটের আগের রাতে রাস্তার ইঁট কিংবা বিদ্যুতের খুঁটি পাড়ার মোড়ে হাজির করে ফেলা, চাকরি-বিপিএল-জবকার্ড থেকে শুরু করে সব ব্যাপারে নেতাদের কল্পতরু সাজা, ক্লাবে ক্লাবে টিভি, ক্যারম বোর্ড ইত্যাদির সরবরাহ, এসব তো আছেই। সরাসরি টাকা দিয়ে ভোট কেনা গোটা দেশে আজ সাধারণ ঘটনা বলেই মানুষ মেনে নিয়ে থাকে। দরিদ্র মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের মনুষ্যত্বকে চূড়ান্ত অপমান করে মাত্র এক বোতল মদ, দু-এক কিলো চাল আর কিছু টাকা ছড়িয়ে গোটা মহল্লার ভোট ম্যানেজ করার দক্ষতাটি ভোটবাজ নেতারা ভালোই আয়ত্ত করেছেন। নির্বাচনী প্রচারে যে চোখ ধাঁধানো ঝলমলে আয়োজন প্রকাশ্যে আমরা দেখি তার নেপথ্যে কাজ করে যায় কয়েক হাজার কোটি কালো টাকার অদৃশ্য শক্তি। পাড়ায় পাড়ায় মস্তান বাহিনীর দাপট ছিল। বর্তমানে আবার বাহুবলী নেতা বলে একটি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। অর্থাৎ মস্তানরাই এখন সরাসরি এমপি, এম এল এ হচ্ছে। বর্তমান লোকসভা সদস্যদের মধ্যে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতির মতো জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত বা দাগি সাংসদের সংখ্যা ৭০ থেকে ৮০ বলে জানা যায়। লোকসভা কিংবা বিধানসভায় দলীয় শক্তি প্রদর্শনের জন্য টাকার বিনিময়ে এমপি, এমএলএ বেচাকেনা আজ নিতান্ত সাধারণ ঘটনা। ব্যক্তিগতভাবে কোনও জনপ্রতিনিধি যদি দুর্নীতিগ্রস্ত নাও হন, তা হলেও এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যদি তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন না করেন, আজকের সর্বব্যাপক দুর্নীতি চক্রের মধ্যে তিনিও একজন পরোক্ষ মদতদাতা রূপে গণ্য হতে বাধ্য। এক একজন জনপ্রতিনিধি জেতার পর বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে যান। শুধু তাই নয় রাজনৈতিক দলগুলির তহবিলেও টাকা উপচে পড়ে। এই বিশাল সম্পদের উৎস কি? কোনও নেতার ব্যক্তিগত দুর্নীতি দিয়ে তো এর ব্যাখ্যা করা যায় না।

রাইট টু রিকল

আমাদের দল প্রথম থেকেই দেখিয়ে এসেছে বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনে কারা জিতবে, তার নির্ণায়ক শক্তি হল, দেশের মূল চাবিকাঠির অধিকারী পুঁজিপতি শ্রেণীর ইচ্ছা। পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থে কোন দলকে ক্ষমতায় আনার প্রয়োজন, সেই অনুসারে কর্পোরেট পুঁজির মালিকানাধীন সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও প্রচারের ঝড় তোলে। পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রয়োজনে প্রচারের দাপটে কাউকে রাতারাতি নেতা বানানোর ক্ষমতা রাখে আজকের শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় যে কোনও রাজনৈতিক দলই কোন না কোনও শ্রেণীর প্রতিনিধি। দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (সি)-কে বাদ দিলে বাকি সমস্ত দলই বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা এবং তার থেকে ফয়দা তোলার কাজ করে চলেছে। পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে এই দলগুলি ভারতের রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ। পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্বকে ঘিরেই এদের পরস্পরবিরোধী ভূমিকা। মাঠে ময়দানে বা সংসদীয় ফোরামগুলির অভ্যন্তরে যে প্রবল লড়াকু ভাব আমরা দেখি তার কিছুটা জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, আর বেশিরভাগটাই নিজ নিজ পৃষ্ঠপোষক পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থকে রক্ষা করার প্রয়াস। এই দ্বন্দ্ব আবার মিলে যায় যখন পুঁজিপতিশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থের প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। পুঁজিপতিদের অর্থেই চলে এই সমস্ত রাজনৈতিক ভোটবাজ দলগুলি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বুর্জোয়া সংসদীয় নেতারা এত কুৎসিত দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত হননি। ব্যক্তিগতভাবে সৎ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ নেতা তখনও নিতান্ত অমিল হয়নি। বামপন্থী বলে পরিচিত তৎকালীন অবিভক্ত সিপিআই নেতা-কর্মীদের মধ্যেও সততা নিষ্ঠা দেখে মানুষ আকৃষ্ট হত। সেই সময়েই এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে আমাদের দলের পক্ষে এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চরিত্র ধরতে অসুবিধা হয়নি। বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা যখন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল, তখন জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা এর মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও প্রতিফলিত হত। বর্তমান যুগে পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে, তখন এই ব্যবস্থায় জনগণের ন্যূনতম দাবি দাওয়া আদায়ের আন্দোলনের মধ্যেও সে তার মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাচ্ছে। এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাই যেকোনও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, যা একদিন বুর্জোয়ারাই সৃষ্টি করেছিল, তাকে দু’পায়ে মাড়িয়ে যেতে চায়। আজকের দিনে বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা আর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না বরং জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই ব্যবস্থার সাথে একেবারে নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যে মানুষগুলি জড়িয়ে থাকে, তারা যদি এই ব্যবস্থার শ্রেণীচরিত্র অর্থাৎ পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত স্তরে স্তরে এই ব্যবস্থা যে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থকেই যে কোনও মূল্যে রক্ষা করে, সে ব্যাপারে সচেতন না হন, পাশাপাশি এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভাঙবার বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার সামগ্রিক প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং সেই আন্দোলনের সম্প্রসারিত রূপ হিসাবে পঞ্চায়েত, বিধানসভা, লোকসভার মঞ্চকে ব্যবহার করার জন্য সচেষ্ট না হন, তাহলে তিনি যতই সৎ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন লোক হোন না কেন, জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে তিনি বাধ্য।

কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে আমাদের দল ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময়ই দেখিয়েছিল, জনগণকে বুঝতে হবে যে, সৎ এবং যোগ্য জনপ্রতিনিধি এইসব ফোরামের মধ্যে যতই সংগ্রামী ভূমিকা পালন করুন তার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু দাবি আদায় হতে পারে, কিন্তু জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সাময়িক স্বস্তি মিলতে পারে, এর বেশি কিছু হবে না। এ দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সীমাবদ্ধ শুধুমাত্র পাঁচ বছরে একবার ভোটদানের মধ্যেই। শাসকশ্রেণী চেয়েছে জনগণ যাতে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে সক্রিয় ভূমিকা না নেয়। যতই রাগ-ক্ষোভ জমুক, জনগণ নেতাদের বাণী শুনে অপেক্ষা করে থাকবে কবে আবার ভোট আসবে, এছাড়া তাদের আর কিছু করণীয় নেই। বিপ্লবী শক্তি হিসাবে এর বিপরীতে আমাদের দল চেয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য জনগণের সক্রিয় ভূমিকা। যে ভূমিকা ছাড়া, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, জনস্বার্থবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে, জনপ্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে কোনও রকম কার্যকরী প্রতিরোধ সম্ভব নয়। ‘রাইট টু রিকল’-এর অধিকার আদায় করা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার প্রয়োগ ঘটানো গেলে জনগণের হাতে এটি একটি অস্ত্র হিসাবে কাজ করবে। যে কারণে আমরা ‘রাইট টু রিকল’-এর দাবি তুলেছি। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত সরকারই জনগণের এই সক্রিয় ভূমিকাকে ভয় পেয়েছে।

এই বারে যখন নতুন করে দাবিটি সামনে এল, দেখা গেল কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী সলমন খুরশিদ, বিজেপির মুখপাত্র মুখতার আব্বাস নকভি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ওয়াই এ কুরেশি থেকে শুরু করে প্রায় সব কর্তাব্যক্তিরাই এই দাবির বিরোধিতা করছেন। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সলমন খুরশিদ বলেছেন, ‘রাইট টু রিকল একটি বৃহত্তর কিন্তু অত্যন্ত দুরূহ ধারণা।’ বিজেপি নেতা বলেছেন, ‘আমাদের দলের এ বিষয়ে আপত্তি আছে।’ দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, ‘এই ধারণা ভারতে চলবে না...এটা দেশকে অস্থির করে তুলবে, সর্বত্র যেখানেই মানুষের ক্ষোভ থাকবে সেখানেই মানুষ জনপ্রতিনিধিকে ফিরিয়ে নিতে চাইবে’। এ দেশেরই পঞ্চায়েত স্তরে পাঞ্জাব (১৯৯৪), বিহার (২০১০), মধ্যপ্রদেশ (২০০০), মহারাষ্ট্র এবং ছত্তিশগড় (২০০৪) ‘রাইট টু রিকল’-এর কথা বলেছে কিন্তু তার প্রয়োগের কোনও ব্যবস্থা নেই। শ্রীকুরেশি বলছেন, এর ফলে যে দল ভোটে হেরে যাবে তারা মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগাবে — এটা ছেঁদো কথা। একটা কথা তাঁরা মানছেন, ভোটে যারা জেতে তারাই জনপ্রিয় নয়। ঠিক তাই, না হলে অধিকাংশের সমর্থন নিয়ে জিতলেও অল্প দিনের মধ্যে জনমত তার বিরুদ্ধে চলে যাবে কেন! ‘রাইট টু রিজেক্ট’ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীকুরেশি বলেছেন, তাঁর সবচেয়ে বড় ভয় হল এই অধিকার দিলে মানুষ ‘সব প্রার্থীকেই বাতিল করবে।’ এক নিঃশ্বাসেই তিনি বলেছেন, ‘রাইট টু রিজেক্টে’র মতো নেগেটিভ ধারণার বদলে আপনারা কেন ভাল প্রার্থীকে বেছে বার করছেন না?’ তিনি ভালোই জানেন, ভোটবাজ সংসদীয় দলগুলিতে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবার দশা। কোনও দুর্নীতিতে বা জনস্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত নয় এমন মানুষ তারা পাবে কোথায়? কারণ তারা এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকেই রক্ষা করতে চায়। যথার্থ জনগণের প্রার্থী একমাত্র সেক্ষেত্রেই মিলতে পারে, যেখানে শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে কর্মী ও নেতা হিসাবে মানুষের সামনে এসেছেন এমন কেউ প্রার্থী হন। যেমন করে আমাদের দলের বিধায়ক, সাংসদরা জয়ী হয়েছেন। সেইজন্য এদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জনস্বার্থ রক্ষা করার একটা দরদী মন আছে। তার জন্য অসংখ্য শহিদের রক্ত, মায়ের চোখের জল, বহু নেতার মিথ্যা মামলায় কারাবাসের মতো মূল্য ঐ সমস্ত অঞ্চলের মানুষকে দিতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এইরকম জনপ্রতিনিধির সংখ্যা মুষ্টিমেয় হতে বাধ্য। কর্পোরেট আশীর্বাদ ধন্য সংবাদমাধ্যমও এদের প্রচার দেবে না। ফলে জনগণ এমন প্রতিনিধি পাবে ক’জনকে?

ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, সুইজারল্যান্ড-এর মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো শুরুতে তাদের নির্বাচনী ব্যবস্থায় ‘রাইট টু রিকল’-এর ধারণা যুক্ত করেছিল। তখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশের যুগ। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাওয়ার পর আজ ঐসব দেশে এই অধিকার নিছক কাগুজে অধিকারে পরিণত হয়েছে। সংবিধানে লেখা আছে, কিন্তু বাস্তবে তার কোনও মূল্য নেই। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপ ও এশিয়া জুড়ে যে বিশাল ভূখণ্ডে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু করেছিল, সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষকে ব্যাপক অর্থে ‘রাইট টু রিকল’-এর অধিকার দিয়েছিল। স্তরে স্তরে সোভিয়েতগুলোর সমস্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষ অবাধে এই অধিকার প্রয়োগ করেছেন। সোভিয়েত বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই এ বিষয়ে লেনিনের রচিত ডিক্রিতে বলা হয়েছিল, ‘কোনও নির্বাচিত সংস্থা বা প্রতিনিধিসভা যথার্থ গণতান্ত্রিক এবং জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হতে পারে না, যদি না রাইট টু রিকল প্রয়োগ করার অধিকার নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে থাকে এবং তাঁরা তা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রকৃতঅর্থে গণতন্ত্রের এই মূল নীতিটি কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই সংবিধানসভা সহ সমস্ত নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে।’ (রচিত :১৯ নভেম্বর ১৯১৭/ লেনিন ইন্টারনেট আর্কাইভ) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাময়িক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে পুরাতন সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেঙে যতগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে তারা কেউই এই অধিকার বজায় রাখেনি। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যারা এগোচ্ছে

পাঁচের পাতায় দেখুন

লিবিয়া ঃ কাঠগড়ায় তোলা হোক ওবামা-সারকোজি-ক্যামেরনকে

গদ্দাফি হত্যার মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসররা অফ্রিকা মহাদেশ দখলের বহুদিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পথে অনেকটাই এগোল। শিকার হল একটি স্বাধীন দেশ, তার রাষ্ট্রনায়ক, আর তার নিরীহ দেশবাসী।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি লিবিয়ার বেনগাজিতে গদ্দাফির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দাবি করে যে, বিক্ষোভ দমন করতে গদ্দাফি সরকার নৃশংস দমনপীড়ন ও হত্যা চালাচ্ছে। তাদের হয়ে প্রচারমাধ্যমে ব্যাপক গদ্দাফিবিরোধী প্রচার শুরু হয়। এমন মিথ্যাও প্রচার করা হয় যে, লিবিয়ার সরকার বিমানবাহিনী ব্যবহার করে বোমা বর্ষণ করছে ওই বিদ্রোহীদের উপর। একে ভিত্তি করেই ওই বিদ্রোহীরা সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে আওয়াজ তোলে যে, আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন তাদের না বাঁচালে তারা শেষ হয়ে যাবে। একে হাতিয়ার করে সাম্রাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব আনে, রাষ্ট্রসংঘও ন্যাটোর হস্তক্ষেপ করা দরকার বলে রায় দেয়।

ন্যাটোর বিমান আক্রমণের তিন মাসের মাথায় আফ্রিকান ইউনিয়ন (এ ইউ) রাষ্ট্রপুঞ্জে চিঠি দিয়ে পরিষ্কার বলে, সরকার এবং সরকারবিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে লড়াই কখনওই জেনোসাইড বা গণহত্যা নয়, এটা গৃহযুদ্ধ। কোনও গৃহযুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশেষ কোনও পক্ষ অবলম্বন করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রপুঞ্জকে অবশ্যই দুই পক্ষের সাথে কথা বলতে হবে। কেউ কেউ দাবি করেছে, কর্নেল গদ্দাফিকেই আগে সরে যেতে হবে, তারপর কথা হবে। সেটাও ঠিক নয়, এই অভিমত জানিয়ে এ ইউ বলে, গদ্দাফি থাকবেন না যাবেন — তা ঠিক করবে লিবিয়ার মানুষ। এ ইউ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে, এই যুদ্ধ অপ্রয়োজনীয়, অবশ্যই এই যুদ্ধ থামানো উচিত। তারা আরও বলে, গদ্দাফি কথা বলতে চাইছেন, কিন্তু বিদ্রোহী নেতারা চাইছে না, তারা গদ্দাফির পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছে। তাহলে বিদ্রোহীদের লড়াই তারাই লড়ুক, ন্যাটো তাকে সাহায্য ও সমর্থন করা বন্ধ করুক।

আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির এই বক্তব্যকে আমল দিল না সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল রাষ্ট্রসংঘ। দুর্বল দেশগুলির, বিশেষ করে সেগুলি যদি মার্কিন বা তার দোসর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির স্বার্থবিরোধী হয়, তাহলে তাদের হাজার আবেদন রাষ্ট্রপুঞ্জের টেবিলের তলায় চাপা পড়ে থাকে। তাই প্যালেস্টাইনে নির্মম গণহত্যা চালিয়েও ইজরায়েল মার্কিন প্রসাদ লাভ করে।

লিবিয়ার পশ্চিমাঞ্চল পর্বতমালায় বিদ্রোহীদের অস্ত্র বিলিয়েছে বলে ফ্রান্স খোলাখুলি স্বীকার করেছে। ১৯৭৩-এ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত আইনকে সরাসরি ভঙ্গ করেছে ফ্রান্সের এই সাহায্য। আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের অপরাধ করেও ফ্রান্সের উঁচু মাথা। কারণ, লুঠেরা মার্কিন ন্যাটো জোটের সে অংশীদার।

লিবিয়ার জনসংখ্যা এমনিতেই কম। সেই দেশে ৫০ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে বিরোধী জোট এবং ন্যাটো। ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত। ঘরবাড়ি, শিশুকেন্দ্র, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ন্যাশনাল ডায়াবেটিক গবেষণা কেন্দ্র, পঙ্গু শিশুকেন্দ্র, অক্সিজেন সরবরাহ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাকেন্দ্র — সমস্ত কিছুই ন্যাটোর বিমান হামলায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা দেশকে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে। যাত্রীবাহী বাস, হোটেল, রেস্তোঁরা, বড় বড় বিল্ডিং কমপ্লেক্স — নাসের বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বত্র নির্বিচারে বোমা মেরেছে ন্যাটো। এটা কোন ধরনের মানবাধিকার রক্ষা? এই সংক্রান্ত কোনও খবর জোট সমর্থক সংবাদমাধ্যমে বের হয়নি। কারণ তারা তখন গদ্দাফির অত্যাচার, হত্যা, স্বৈরতন্ত্র দেখাতে ব্যস্ত। দেখা গেছে, ত্রিপোলিতে গত জুন মাসে যখন গদ্দাফি বাহিনীর পতনও হয়নি, কোনও গোলাগুলিও চলেনি, তখনও পেটোয়া সাংবাদিকদের বুলেটপ্রুফ জামা পরিয়ে ছবি তুলে তুমুল যুদ্ধের খবর প্রচারিত হয়েছে। তথাকথিত বিদ্রোহী বাহিনীর যুদ্ধে অগ্রগতির মিথ্যা খবর রমরমিয়ে প্রচার করা হয়েছে গোটা বিশ্ব জুড়ে।

গদ্দাফি একটি ছোট্ট গ্রাম সির্তেকে একটি সাজানো শহরে পরিণত করেছিলেন। ন্যাটো বাহিনী তিন সপ্তাহের ক্রমাগত বোমাবর্ষণে এটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। গদ্দাফির সমর্থক শহর সির্তে এবং বানি ওয়ালিদ-কে ভুতুড়ে শহরে পরিণত করে। শহরবাসীদের হয় মেরে ফেলা হয়েছে, নয়তো তারা শহর ছেড়ে মরুভূমিতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

বহু কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানকে মেরে ফেলেছে 'বিদ্রোহী'রা তথা ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল বা এন টি সি বাহিনী। লিবিয়াতে জনসংখ্যা কম থাকায় পার্শ্ববর্তী নিগার, মালি, চাদ থেকে আসা বহু দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক এ দেশের কলে-কারখানায় কাজ করে। ন্যাটোর সাহায্যে নানা শহর দখল করার পর তথাকথিত বিদ্রোহী বাহিনী শুধু কৃষ্ণাঙ্গ বলেই এদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, হত্যাও করেছে অনেককে। এ জিনিস গদ্দাফির শাসনে ঘটেনি।

ন্যাশনাল ট্রানজিশন্যাল কাউন্সিলের নেতা কারা

যে বিদ্রোহীরা আজ গদ্দাফির স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লিবিয়ায় গণতন্ত্র স্থাপনের কথা বলে দেশটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল, তাদের আসল রূপটা কী? এরা ক্ষমতা দখলের পরপরই লিবিয়ার জেলে বন্দি ৬০০ আলকায়দা জঙ্গিকে মুক্ত করে দেয়। এই আলকায়দা জঙ্গিরা ইরাকে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে কাজ করেছিল।

লিবিয়ায় আগ্রাসী ন্যাটো বাহিনী

সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতার ধুয়া তুলে ২০০১ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়াতে লিবিয়ান ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ (এল আই এফ জি)-র বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছিল। আসলে এই অজুহাতে লিবিয়ায় তারা ঢুকতে চেয়েছে। আর বর্তমানে গদ্দাফিবিহীন লিবিয়ায় এই গোষ্ঠীটিকেই মদত জুগিয়েছে তারা। সাথে সাথে ন্যাশনাল ফ্রন্ট ফর দি স্যালভেশন অব লিবিয়া এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো মৌলবাদী শক্তিগুলিকেও তারা এই কাজে ব্যবহার করছে। আর সাম্রাজ্যবাদী অর্থে পুষ্ট, বিশেষ করে ফরাসি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত ও পরিচালিত 'মানবাধিকার' সংগঠনকেও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবহার করেছে লিবিয়ার অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ শুরু করতে। এরাই বিদ্রোহী কাউন্সিলের নেতা। এই নেতাদের অনেকেই নানা কুকর্ম, দুর্নীতি এমনকী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। কিন্তু তাতে মার্কিন এবং তার দোসর সাম্রাজ্যবাদীদের কোটি কোটি ডলার পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। কারণ এদের উভয় পক্ষের একটাই এজেন্ডা ছিল, তা হল গদ্দাফির শাসনের অবসান ঘটানো, গদ্দাফিকে হত্যা করা।

সাম্রাজ্যবাদীরা এন টি সি-র পক্ষে প্রচার করতে গিয়ে বলেছে, দেশের নানা উপজাতির প্রতিনিধিত্ব গদ্দাফির শাসনে নাকি ছিল না। কোনও বিশেষ উপজাতি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ছিল কি ছিল না, তা অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু গদ্দাফি যে পরস্পর বিবদমান উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে একটি ছাতার তলায় এনে তাদের পারস্পরিক বিবাদকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে কারণেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক প্রশ্ন তুলেছেন, আমেরিকা এবং তার দোসরদের লিবিয়া আক্রমণের পিছনে লক্ষ্য কী? তারা কী চায়? গোটা লিবিয়াকে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের গহ্বরে ঠেলে দেওয়াই কি তাদের উদ্দেশ্য? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, আসল মতলব এটাই। অনৈক্য ও নৈরাজ্যে ছারখার হলে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ-লুঠের হীন পরিকল্পনা কার্যকর করা সহজ হবে।

গদ্দাফিকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে ন্যাটো

গদ্দাফির মৃত্যুর পর একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে, তাদের ড্রোন বা প্রিডেটর হামলায় ধরা পড়েছেন গদ্দাফি। আবার ফ্রান্স বলেছে, তাদের রাফেল ফাইটার জেটই আসল আক্রমণ চালিয়েছে। যদিও এ কথাটা সামনে আসছে না যে, মার্কিন বা ফরাসি বাহিনী আক্রমণ হেনেছে কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, যুদ্ধ যেখানে তখন চলছিল সেখান থেকে দূরে সির্তে শহরে। শুধুমাত্র গদ্দাফিকে হত্যাই এর উদ্দেশ্য ছিল। আর সেটাই সুপরিকল্পিতভাবে সেই দেশের লোককে দিয়েই করালো ন্যাটো। বিদেশি শক্তি হত্যা করেছে — এই সত্যটাকে আড়াল করতে চেয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, কিন্তু জড়িয়ে পড়েছে আরেকটি প্রবল বিতর্কে। এ বিতর্ককে চেষ্টা করেও চাপা দিতে পারা যাচ্ছে না। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি রচিত আইন, তাদের অঙ্গুলিহেলনে, তাদের নির্মম স্বার্থরক্ষার্থে চলা রাষ্ট্রপুঞ্জের নিয়মকানুন — কোনও কিছু দিয়েই গদ্দাফি-হত্যাকে ন্যাটো আইনসম্মত করতে পারছে না, ন্যায়সঙ্গত তো দূরের কথা। দেশের মানুষের চোখে ধুলো দিতে প্রচারে গদ্দাফিকে দৈত্য বানিয়েছিল তারা। তার নামে তৈরি করেছিল মিথ্যা অপরাধের তালিকা। কিন্তু এখন নিজেরাই একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। ঘরে বাইরে সাম্রাজ্যবাদীরা তাই প্রবল চাপের মুখে। শত অন্যায়কারী রাষ্ট্রপুঞ্জও তাই বলতে বাধ্য হয়েছে, গদ্দাফি হত্যার তদন্ত হওয়া উচিত। যদিও সবটাই চালাকি। যার বা যাদের গুলিতে শেষ পর্যন্ত গদ্দাফি মারা গেছেন, সে কি আসল দোষী, নাকি আসল অপরাধী ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট সারকোজি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরুন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা? এঁদের কোনও বিচার হবে কি?

রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ দূত ক্রিস্টোফার হেইনস বলেন, '১৯২৯ সালে জেনিভা কনভেনশনে গৃহীত রেজোলিউশন অনুযায়ী কোনও যুদ্ধবন্দিকে জীবিত অবস্থায় ধরা হলে তাকে কোনওভাবেই হত্যা করা যাবে না। এমনকী শারীরিক বা মানসিকভাবেও তার উপর কোনও অত্যাচার করা যাবে না। বিচার পাওয়ার সব রকমের অধিকার যুদ্ধবন্দির আছে। গদ্দাফির ক্ষেত্রে এই আইন কি কোনওভাবে মানা হয়েছে?

গদ্দাফির ছেলে মুতাস্সিম গদ্দাফিকেও ধরা হয়েছে জীবন্ত অবস্থায় তার বাবার সাথেই। এন টি সি যোদ্ধারা যে ভিডিও প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, "কাস্টডিতে তিনি জীবন্ত অবস্থায় ছিলেন, এমনকী সিগারেট পর্যন্ত খাচ্ছিলেন। কিছু এন টি সি যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি জেল-হেফাজতে যে ঘরে ছিলেন সেখানে কিছুক্ষণ পর, অন্য একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে গলায় এবং পেটে গুলি লাগা অবস্থায় তিনি মৃত।" (রয়টার, ২১-১০-১১)

এর আগে পশ্চিমী জোট গদ্দাফিকে হত্যার জন্য ২ কোটি ডলার অর্থমূল্য ঘোষণা করেছিল। এখন তারা কী করবে? তথাকথিত আইনকে সম্মান জানিয়ে দোষীদের শাস্তি দেবে, নাকি পুরস্কার দেবে?

গদ্দাফির জন্ম যে উপজাতিতে, তারা এক বিবৃতিতে ইসলামি কনফারেন্সের সংগঠন এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে আহ্বান জানায়, এন টি সিকে চাপ দিয়ে যেন তারা শহিদ গদ্দাফির দেহ তাদের কাছে ফেরত দেয়। উপযুক্ত মর্যাদায় তাঁকে সমাধিস্থ করতে চায় তারা। কিন্তু এর কোনওটাই করা হয়নি। জীবন্ত গদ্দাফিকে আফ্রিকায় প্রবেশের পথে সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন একটা বাধা হিসাবে দেখেছে, তেমনি মৃত গদ্দাফিকেও তারা ভয় পেয়েছে। হয়ত গদ্দাফির স্মৃতি লিবিয়ার মানুষকে আবার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করবে। যেমন, গদ্দাফিকে অনুপ্রাণিত করেছিল ইতালির ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা মহান সংগ্রামী ওমর মুক্তার।

মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন, গদ্দাফির মৃত্যুতে চিৎকার করে সরাসরি এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'উই কেম, উই স, হি ডায়েড'। গদ্দাফি হত্যার কয়েকদিন আগে সৌদি রাজা সুলতান-বিন-আবদুল-আজিজের মৃত্যু উপলক্ষে হিলারি ক্লিনটন সৌদি আরবে এসে তাঁর গভীর শোকজ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সুলতানের অভাব তাঁরা অনুভব করবেন। যেন সুলতানরাজ সৌদি আরবে গণতন্ত্রেরই সমার্থক, সেখানে মানবাধিকার সুরক্ষিত। এই সৌদি আরবের সুলতানকে ওবামা প্রশাসন নির্দেশ দিয়েছে বাহারিনের স্বৈরতান্ত্রিক সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দমন করতে যেন দু'হাজার সৈন্য পাঠায়।

সংবাদে জানা যায়, গত ১৭ অক্টোবর বানি ওয়ালিদের পতন ঘটলে ত্রিপোলি যান হিলারি। সেখানে বিদ্রোহী সেনাদের সাথে নিয়ে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে আসেন, 'আর ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমরা আশা করছি, ধৃত বা মৃত হবে গদ্দাফি আর কয়েকদিনের মধ্যেই। তাই মরতেই হল গদ্দাফিকে ঠিক দু-তিন দিনের মাথায় ২০ অক্টোবর।

কেন গদ্দাফি হত্যা

লিবিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন গদ্দাফি। আবার অপরদিকে তিনি আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন।

লিবিয়ার বর্তমান ভূখণ্ডটি অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। অটোমান-ইতালি যুদ্ধের পর ইতালির উপনিবেশ হয়ে যায় এই ভূখণ্ড। তখন ইতালির ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে লিবিয়ার মানুষের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ চেতনার জন্ম হয়। এই ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন ঔপনিবেশিক শাসক সাম্রাজ্যবাদীদের লাগাতার বিরুদ্ধতা করে যাচ্ছিল, বহু সময় শাসকের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, তখন লিবিয়াকে ভাগ করে দুর্বল করে দেওয়ার চক্রান্ত করতে থাকে সাম্রাজ্যবাদীরা। এটা এবারেও করছে পশ্চিমী দুনিয়া। ১৯৪৩ এবং '৫১ সালের ইতিহাসে চোখ রাখলে এ কথার সত্যতা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উত্তর আফ্রিকায় ইতালি এবং জার্মানির পরাজয়ে লিবিয়াকে ভাগ করে দখল করার জন্য সকলে মিলে একটা ট্রাস্টির পরিকল্পনা করতে থাকে। এখানে একটি রাজতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় তারা। যেমন কুয়েত,

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুঁজির শাসনই শেষ কথা নয়

বার্তা দিচ্ছে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন

কায়রোর তাহরির স্কোয়ার, এথেন্সের সিনটাগমা স্কোয়ার, ইয়েমেন, আলজিরিয়া, মাদ্রিদের সেন্ট্রাল স্কোয়ারের গণবিক্ষোভের আগুন এখন ছড়িয়ে পড়েছে নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে। পুঁজির নির্মম কামড় থেকে মুক্তি চাইছে জীবনযন্ত্রণায় অতিষ্ঠ মানুষ। ধনী দরিদ্রের বিপুল ব্যবধান, বেকারত্ব, ছাঁটাই, চরম মূল্যবৃদ্ধি, জনগণের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে ব্যাপক হারে সরকারি বরাদ্দ ছাঁটাই, গণ-তান্ত্রিক অধিকার হরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে তারা। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্কের জুকোটি পার্কে জমায়েত হতে শুরু করেছে হাজার হাজার মানুষ। রাজপথ কাঁপছে তাদের উচ্চকিত স্লোগানে— মার্কিন কর্পোরেট হাঙরদের হেড অফিস, ব্যবসা-বাণিজ্যের সদর দফতর 'ওয়াল স্ট্রিট দখল করো'। তারা আওয়াজ তুলেছে 'আমরা জনসংখ্যার ৯৯ শতাংশ, ১ শতাংশ পুঁজিপতির লালসা ও দুর্নীতি সহ্য করতে আর রাজি নই'। অতি দ্রুত এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকার প্রায় প্রতিটি শহরে। আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে ইউরোপ ও এশিয়ার অসংখ্য শহরে।

জনজীবনের দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ী মূল শত্রু মুনাফাবাজ কর্পোরেট পুঁজির মালিকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা যত তীব্রই হোক, অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনকারীরা কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। অবশ্য এ আন্দোলন জঙ্গি চেহারা নিলেও আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু শান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার আন্দোলনকারীদের উপর তার দমনযন্ত্র প্রয়োগ করতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলনরত মানুষের উপর পুলিশ টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে, জলকামান ব্যবহার করে তাদের হঠিয়ে দিতে চেয়েছে, গ্রেপ্তার করেছে। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার বন্দর শহর ওকল্যান্ড উত্তাল হয়ে উঠেছিল পুলিশি দমন-পীড়নের প্রতিবাদে। ৩ নভেম্বর অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনকারীরা হাজারে হাজারে জমায়েত হয়েছিলেন ওকল্যান্ড শহরের এক পার্কে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শ্রমিক, কর্মচারী সহ সমাজের সকল অংশের মানুষ। ভোরবেলা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীরা হঠিয়ে দিতে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়লে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এই ঘটনার এক সপ্তাহ আগে এই ওকল্যান্ডেই পুলিশের আক্রমণে এক বিক্ষোভকারী গুরুতর আহত হন, গ্রেপ্তার হন ১০০ জন। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই বিক্ষোভকারীরা জমায়েত হয়েছিলেন। এদিন পুলিশি আক্রমণের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা। সমর্থনে কাজ বন্ধ করে দেন বন্দর কর্মচারীরা। শহরের বেশ কিছু অফিস, দোকানপাট ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মঘটে যোগ দেন পৌরকর্মী ও শিক্ষকরাও।

একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের মুনাফা লালসা ও শোষণ-নিপীড়ণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ হবে আর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ম্যানেজার সরকার, প্রতিবাদকারীদের উপর পুলিশি আক্রমণ চালাবে না, আইনের প্যাঁচে ফেলে তাদের হেনস্থা করবে না — এ হয় না। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সেই ঘটনাই ঘটেছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল, এই আন্দোলনের প্রভাব পুলিশবাহিনী, এমনকী বিচারপতিদের উপরেও পড়ছে। নিউইয়র্কের আলবেনিতে গভর্নর ও মেয়রের আদেশ অগ্রাহ্য করে পুলিশ জানিয়েছে, কোনও আন্দোলনকারীকে তারা গ্রেপ্তার করতে পারবে না। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে নাশভিলে শহরে। আন্দোলনকারীদের মনোবল ভাঙতে সেখানে শহর-কর্তৃপক্ষ প্রতি রাতে কারফিউ জারি করে তাদের গ্রেপ্তার করছে। কিন্তু পরদিন সকালেই স্থানীয় কোর্টের বিচারপতি এই গ্রেপ্তারকে বেআইনি ঘোষণা করে বন্দিদের মুক্তি দিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, আন্দোলন-কারীদের গ্রেপ্তার করার অর্থ নাগরিকদের বাক-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। এভাবেই বিপুল পুঁজির মালিকদের মুনাফালালসার বিরুদ্ধে, কর ছাড় দিয়ে, ঋণ মকুব করে তাদের বহাল তবিয়তে টিকিয়ে রাখার সরকারি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে দেশের ৯৯ শতাংশ মানুষের তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদের উত্তপ্ত হাওয়া এসে লেগেছে সরকারি শাসনযন্ত্রের অংশীদার মানুষগুলির মনেও। নিজেদের মতো করে তাঁরাও এই আন্দোলনের শরিক হচ্ছেন। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন ক্রমেই একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে।

অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের সমর্থনে ভারতেও বিক্ষোভ সংগঠিত হয়ে চলেছে রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আহ্বানে। 'পুঁজির শাসনই শেষ কথা নয়'— অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট সেই বার্তাই ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বে।

'রাইট টু রিকল' প্রসঙ্গে

তিনের পাতার পর

সেই ভেনেজুয়েলা 'রাইট টু রিকল' এর অধিকার চালু করেছে।

আমাদের দেশে 'রাইট টু রিকল' এর দাবিকে কংগ্রেস বিজেপির মতো কেন্দ্রে-রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলি সমর্থন করতে পারছে না কেন?

সাম্প্রতিক দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন থেকে তারা একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝেছে, দেশের আপামর জনসাধারণ এই মসনদ আলো করে বসে থাকা নেতাদের উপর চূড়ান্ত বীতশ্রদ্ধ। মন্ত্রী, সাংসদ-বিধায়করা অধিকাংশই কোটিপতি, জনগণের দুঃখ দুর্দশার সাথে তাদের ন্যূনতম পরিচয় নেই। সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন এই গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক শক্তির উপর ভর করে। এই সব সরকারি দলের নেতারা খুব ভালো করে জানে জনসাধারণের হাতে এতটুকু ক্ষমতা থাকলে তারা এদের টেনে নামাবে। ফলে 'রাইট টু রিকল' কে সমর্থন করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে তারা একথাও বুঝতে পারছে যে জনগণের ক্ষোভ, তীব্র ঘৃণা ফেটে পড়তে চাইছে। যতই যাই বলুক না কেন জনমতের এই প্রবল চাপ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই 'রাইট টু রিকল' সমর্থন করা না করার প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে এই অধিকার চালু করতে গেলে কি কি প্রশাসনিক এবং পদ্ধতিগত সমস্যা হতে পারে সেই সব কথা বলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। এই সব নেতাদের প্রশ্ন করা দরকার তোমরা পরিষ্কার বলো 'রাইট টু রিকল' সমর্থন করো কি না? যদিও আমরা জানি, এদের কাছে এ কথার উত্তর নেই। গণআন্দোলনের চাপে এদের বাধ্য করতে না পারলে জনমতের কোনও দাম এরা দেবে না, সুযোগ পেলেই জনমতকে দু'পায়ে মাড়িয়ে যেতে এদের কোথাও আটকাবে না। আর একটি বিষয় জনসাধারণকে বুঝতে হবে 'রাইট টু রিকল' এর দাবি যদি আদায় করাও যায়, সংঘবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার গণআন্দোলনের চাপ না থাকলে এ অধিকার অন্যান্য অনেক অধিকারের মতো কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। সচেতন সংঘবদ্ধ এবং লাগাতার আন্দোলনই মানুষের অধিকারের গ্যারান্টি। সেই আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি তাই আজ সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

একের পাতার পর

কেন? এ তো, সজ্ঞানে একটা ভ্রান্ত বিপজ্জনক নীতি মানুষের উপর ক্ষমতার জোরে চাপিয়ে দেওয়া। এ ভাবেই তো সিপিএম সরকার একদিন প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ক'দিন আগেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দিল্লিতে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, তাঁর সরকার পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরোধী। এমনকী ৮ সেপ্টেম্বর পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর না করার দাবিতে এ আই ডি এস ও যখন কলকাতায় বিশাল ছাত্রমিছিল করেছিল, তখন সেই আন্দোলনের গুরুত্বকে লঘু করে দেখাতে এই শিক্ষামন্ত্রীই বলেছিলেন, পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার যে কথা তিনি বলেছিলেন, তা কোনও সরকারি সিদ্ধান্ত নয়, একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত মত। অপরদিকে সরকার এবং পুঁজিপতিদের পেটোয়া সংবাদমাধ্যমগুলি আন্দোলনের মূল গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে আড়াল করে ছাত্ররা অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে মিছিলে গিয়েছে কি না, এই কূট প্রশ্ন তুলে বাজার মাত করার চেষ্টা চালিয়ে গেল। সেদিনই বহু শিক্ষক অভিভাবক বলেছিলেন, এর পিছনে একটা অতি জঘন্য ষড়যন্ত্র রয়েছে। তবে কি সেই ষড়যন্ত্রই আজ উদঘাটিত হল!

এ আই ডি এস ও সেদিন এর মারাত্মক কুফলগুলির কথা রাজ্যের মানুষের সামনে তুলে ধরেছিল। তারা দেখিয়েছিল, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল না থাকলে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিকের আগে পরীক্ষায় বসার মানসিকতায় ঠিকমতো গড়ে উঠবে না। কোনও ছাত্র মাধ্যমিকে বসার উপযুক্ত মান অর্জন করেছে কি না তাও বোঝা যাবে না। অপর দিকে ছাত্রছাত্রীরাও বুঝতে পারবে না, তাদের ঘাটতি কোথায় যা অবিলম্বে পূরণ করা দরকার। অভিভাবকরাও তাঁদের সন্তানের অগ্রগতি বুঝতে পারবেন না। মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগে অভিভাবকরা যদি সন্তানের ঘাটতি ধরতেও পারেন, তা কাটাবার সুযোগ-সময় প্রায় থাকবেই না।

এ সব কোনও বিষয়ই সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা ভেবে দেখলেন না। শিক্ষার মতো গুরুতর বিষয়ে তাঁরা শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, অভিভাবক, শিক্ষক সংগঠন বা ছাত্র সংগঠন কারও মতামত নিলেন না। অধিকাংশ শিক্ষক সংগঠন এই নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা সত্ত্বেও তাঁরা সেই মত অগ্রাহ্য করলেন। একে কি গণতান্ত্রিক আচরণ বলে? পূর্বতন সিপিএম সরকার সম্পর্কে তো রাজ্যের মানুষের এই অভিযোগই ছিল যে, এই সরকার চরম অগণতান্ত্রিক, দলতান্ত্রিক। কোনও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই তারা কারও মতামত নেয়নি। এ ভাবেই তারা প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দিয়েছিল। তা হলে এই প্রশ্নে সিপিএম সরকারের সঙ্গে বর্তমান সরকারের কী পার্থক্য থাকল?

মন্ত্রীসভায় পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে গিয়ে শিল্পমন্ত্রী বলেছেন, তাঁরা পরীক্ষা তুলে দিচ্ছেন না। তবে কোনও ক্লাসে কাউকে আটকে রাখা যাবে না। বলেছেন, ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে কী শিখছে তা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকছে। না হলে ছাত্রদের দুর্বলতা ধরা যাবে না। পূর্বতন সিপিএম সরকারও ঠিক এ ভাবেই যুক্তি করেছিল। তারাও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের কথা বলেছিল। সেই গালভরা নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন যে কতটা অন্তসারশূন্য, তা ভুক্তভোগী অভিভাবকরা, এমনকী শিক্ষকরাও জানেন। ঐ 'মূল্যায়ন পদ্ধতিতে' ছাত্রের দুর্বলতা ধরা পড়লেই বা কী? তার সংশোধনের সুযোগ তো নেই। কারণ পাশ তো হয়ে যাবেই। প্রতি বিষয়ে শূন্য পেলেও তো পাশ। রাজ্যের মানুষ তাঁদের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এ ধরনের শিক্ষানীতির সর্বনাশা পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত। এমনকী তাঁরা মনে করেন, এ নিয়ে পুনরায় বিতর্কেরও আর কোনও দরকারই নেই। অবিলম্বে এই ভ্রান্ত শিক্ষানীতি প্রত্যাহার করা হোক।

কিন্তু সরকার কেন এমন একটি সিদ্ধান্ত নিল?

এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সিলেবাস কমিটির অন্যতম সদস্য মর্মর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'যারা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে স্কুল ছেড়ে দেয়, তারা কিন্তু সাক্ষর হিসাবে বিবেচিত হয় না। দেশের সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক ছিল।' (*একদিন পত্রিকা, ৪/১১/'১১*)।

ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ল। সরকারের লক্ষ্য আসলে শিক্ষার প্রসার ঘটানো নয়, তাদের দরকার 'সাক্ষর' নামাঙ্কিত কিছু মানুষের সংখ্যা, যেটা দেখিয়ে তারা বলতে পারবে, তাদের শাসনে কী বিপুল সংখ্যক মানুষ সাক্ষর তথা 'শিক্ষিত' হয়েছে। সরকারি এই কর্তার বক্তব্য থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কেন্দ্রের যে শিক্ষার অধিকার আইন মেনে এই সিদ্ধান্ত বলে কেউ কেউ বলছেন, সেই আইনেরও আসল উদ্দেশ্যটি কী? এই জলভরা পরিসংখ্যান দেখিয়ে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার দেশে বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও কোনও মহল থেকে বাহবা পেতে পারে, কিন্তু তা হবে এক চূড়ান্ত প্রতারণা। সকলেরই মনে আছে, সিপিএম সরকারও রাজ্যের মানুষ কী বিশাল সংখ্যায় সাক্ষর হয়েছে তা দেখানোর নেশায় একের পর এক জেলাকে 'সাক্ষর' ঘোষণা করে বিষয়টিকে মানুষের হাসি-মস্করার বস্তুতে পরিণত করেছিল।

সমাজ ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই শ্রেণী বৈষম্য চায়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকেও প্রাথমিক শিক্ষার মতোই বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেবে। নিম্নবিত্ত, দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা পাশ-ফেল না থাকা এই সমস্ত স্কুলে পড়ে নাম-কা-ওয়াস্তে 'শিক্ষিত' হবে। উচ্চশিক্ষা তাদের কাছে অধরাই থেকে যাবে। যতটুকু কাজের সুযোগ আছে এই শিক্ষা নিয়ে তারা তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না। উচ্চবিত্ত সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা নামকরা বেসরকারি স্কুলে পড়ে উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের দখল নেবে। কারণ সরকারি এই সিদ্ধান্ত বেসরকারি স্কুলগুলিতে কার্যকরী হবে না। সেখানে নামে-বেনামে পরীক্ষা, পাশ-ফেল সবই থাকবে। পূর্বতন সিপিএম সরকারের ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাতে সামিল হয়েছিলেন রাজ্যের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীরা। সেই আন্দোলনে ভাষাচার্য সুকুমার সেন সিপিএম নেতাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, ওরা আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে মূর্খ, গরু করে রাখতে চায়, যাতে ওরা চিরকাল আমাদের ওপর রাখালি করতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী এবং শুভবুদ্ধির মানুষ তৃণমূল সরকারের এই সর্বনাশা শিক্ষানীতি মানতে পারছেন না, এর বিরুদ্ধে তাঁরা দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন। এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও। ইতিমধ্যেই ছাত্ররা রাজ্যের নানা জেলায় পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছে। প্রতিবাদে পথে নেমেছে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ফিরিয়ে আনার সফল আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি। আন্দোলনের চাপে চরম উদ্ধত সিপিএম সরকারকে যেমন প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তনে বাধ্য করা হয়েছিল, তেমনি এই সরকারকেও এই নীতি প্রত্যাহারে বাধ্য করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যত দেরি হবে, ততই বিপুল পরিমাণ ছাত্রের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে। তাই দেরি না করে দলমত নির্বিশেষে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক বুদ্ধিজীবী সহ সকল স্তরের মানুষকে আজ শিক্ষা বাঁচানোর, সভ্যতা বাঁচানোর এই আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

তেল কোম্পানিগুলির ক্ষতির গল্প ফাঁস

একের পাতার পর

পেট্রলের বাজারদর হল ৭৩ টাকা ১৫ পয়সা।

প্রশ্ন উঠছে, সামনে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন থাকা সত্ত্বেও এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপে জর্জরিত সাধারণ মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে হলেও কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রলের দাম বাড়াচ্ছে কেন? আসলে সংকটগ্রস্ত মালিকশ্রেণীকে ছাড় দিতে দিতে ঋণ আর ঘাটতিতে আকণ্ঠ নিমগ্ন সরকার তেল থেকে টাকা তুলে ঘাটতি ভরাতে চাইছে। পুঁজিবাদকে বাঁচাতে গিয়ে বুর্জোয়া সরকারগুলি তাদের তহবিল প্রায় ফাঁকা করে ফেলেছে। বস্তুত তথাকথিত উদার অর্থনীতির যুগে প্রধান ঝোঁকটাই হল মালিকদের ওপর কর কমানো। এস ইউ সি আই (সি)-র বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছেন, তথাকথিত উদার অর্থনীতি আসলে মালিকদের প্রতি উদার ও জনগণের প্রতি কঠোর। এ হেন উদার অর্থনীতির নিয়মানুসারেই কেন্দ্রীয় সরকার কেবল ২০১০-১১ সালের বাজেটে করছাড়, নানাধরনের ছাড়, রিবেট ইত্যাদি আকারে ৫,১১,৬৩০ কোটি টাকা. আয় কমিয়ে ফেলেছে। এর বৃহৎ অংশই গেছে রাঘব বোয়ালদের পেটে। সরকারগুলির আয় কমে গেল কেন সে ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলিতে উচ্চবাচ্য নেই। অথচ সরকারি খরচ কমানোর কথা উঠলেই একশ্রেণীর সংবাদপত্র খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে খরচ কমানোর ধুয়ো তোলে। ঘাটতি কমানোটা এখন সরকারের মাথাব্যথা হলেও মালিকদের উপর কর তারা বাড়াতে চায় না। তাই আয় বাড়িয়ে ঘাটতি কমাবার জন্য সরকারি কর্তারা পেট্রোপণ্যকে কামধেনু হিসাবে ব্যবহার করছে।

আপাতত শুধু পেট্রলের দাম বাড়ছে বলে বা বাস-লরি ডিজেলে চলে তাই বাসভাড়া এখনই বাড়ছে না বলে, খুশি হওয়ার কিছু নেই। পেট্রোপণ্যের দাম বাড়া মানেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে নানা ধরনের প্লাস্টিক পলিথিন, ওষুধ, রং অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম ও পেট্রলজাত সব জিনিসের দাম বাড়া। এর ফলে বীজ, সার, বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে সমস্ত কলকারখানার খরচ বেড়ে যাবে, ফলে উৎপাদিত পণ্যের দাম মালিকরা বশংবদ সরকারকে দিয়ে বাড়াবার চেষ্টা করবেই। তার ওপর যদি প্রস্তাবিত ডিজেল, রান্নার গ্যাস, কেরোসিনের দাম বাড়ানো হয় তবে তো সোনায় সোহাগা। আমাদের মতো দেশে, যেখানে যে কোনও অজুহাতেই দাম বাড়ানো হয়ে থাকে, কোনও একটা অজুহাত পেলেই সব জিনিসের দাম মালিকরা বাড়িয়ে দেয়, সেখানে পেট্রলের দামবৃদ্ধির অজুহাতে সব জিনিসেরই দাম বাড়াবার চেষ্টা হবে।

পেট্রোপণ্যের দাম বিশ্ববাজারে যতই বাড়ুক, এর ওপর চাপানো কর প্রত্যাহার করে নিলে পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাস কোনওটারই দাম বাড়াতে তো হবেই না বরং প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে। কারণ পেট্রোপণ্যের ওপর ভারত সরকারের ও রাজ্য সরকারগুলির চাপানো করের পরিমাণ প্রায় ৫০ শতাংশ। সংবাদে প্রকাশ, গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোপণ্য থেকে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা কর আদায় করেছে (সূত্রঃ আনন্দবাজার ২-১১-১১) অথচ, ওই বছর সরকার তেল বাবদ ভরতুকি দিয়েছে ৪০,৪৩০ কোটি টাকা। তাহলে কোনটা বেশি।

তেল কোম্পানিগুলির দেওয়া ব্যয়ের হিসাবে যে জল মেশানো আছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকারি-বেসরকারি সব কোম্পানিরই কর্তাব্যক্তিদের মোটা মাইনে, বিনা পয়সায় হাজারো সুযোগ সুবিধা বাবদ অস্বাভাবিক খরচ হয়। এক্ষেত্রে মাথাভারি প্রশাসনিক ব্যয় কমানো যায় কিনা তা কোনওদিন খতিয়ে দেখেনি সরকার। তবু যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তেল কোম্পানিগুলির দেওয়া হিসাব ঠিক, তাহলেও দৈনিক ৩৩৩ কোটি টাকা লোকসান হলেও পেট্রোপণ্যের দাম বাড়াবার প্রশ্নই আসে না কারণ, তাতেও মোট লোকসানের পরিমাণ হয় ১,২১,৫৪৫ কোটি টাকা। যা সরকারের আদায়ীকৃত করের (সংবাদে প্রকাশ, ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা) চেয়ে কম। তেল কোম্পানিগুলির লাভের সীমা যে নেই তা তাদের বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট এবং শেয়ারের দাম দেখেই বোঝা যায়। আইটিসি বা রিলায়েন্সের শেয়ার কিনতে পাওয়া হাতে চাঁদ পাওয়ার সমান। তবুও তাদের আরও লাভ চাই আর তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য রয়েছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। মূল্যবৃদ্ধির আকারে সব বোঝাটাই তারা চাপাচ্ছে জনসাধারণের ঘাড়ে। ইতিমধ্যেই এস ইউ সি আই (সি) মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে, গত ৪ নভেম্বর রাজ্যে রাজ্যে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। কলকাতা সহ ভারতবর্ষের সমস্ত শহরে সংগঠিত হয়েছে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল।

লিবিয়া

চারের পাতার পর

বাহারিন, কাতার ইত্যাদিকে নিয়ে সংযুক্ত আরব আমির শাহী গড়ে উঠেছে। সেখানে শাসনের ধাঁচা হবে রাজতান্ত্রিক, দেশের মানুষের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন হবে গৌণ। ১৯৫১ সালে যদি লিবিয়ার মানুষ এটা মেনে নিত, তারা যেটুকু স্বাধীনতা পেয়েছিল সেটুকুও হারাত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালি এবং জার্মানির বিরুদ্ধে লড়ার জন্য লিবিয়া মিত্রশক্তির ব্রিটিশ বাহিনীকে জায়গা করে দেয়। ১৯৪২ সালের ২০ নভেম্বর বেনগাজিতে এবং '৪৩ সালের ২৩ জানুয়ারি ত্রিপোলিতে ব্রিটিশ সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা লিবিয়াকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেবে বলে কথা দিলেও শেষ পর্যন্ত ত্রিপোলিটানিয়া এবং সাইরেনিকাকে ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে এবং লিবিয়ার এক তৃতীয়াংশ ফ্রেজান অঞ্চল, যেটি আলজেরিয়া, নিগার, চাদের সীমানা ঘেঁষা, সেটিকে ফরাসি উপনিবেশ হিসাবে শাসন করতে চাইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পরাজয়ের পরও ব্রিটিশ ও ফরাসিদের সাথে একই সুরে একই সাথে ইতালি লিবিয়াকে ভাগ করে তার স্বাধীন সত্তাকে মারতে চায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় বিষয়টি ওঠে। কিন্তু হাইতির একটি বিরুদ্ধ ভোটে লিবিয়াকে ভাগ করার প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু তাতেও এই পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে যায়নি। দেশের ভিতরে সাম্রাজ্যবাদীরা নানা ধরনের ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। এই সময়ই রাজা ইদ্রিসের প্রবেশ। লিবিয়ার রাজা ইদ্রিসকে সামনে রেখে অনির্বাচিত জাতীয় অ্যাসেম্বলি খাড়া করে তথাকথিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা চালাল সাম্রাজ্যবাদীরা। লিবিয়ার জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ যারা ত্রিপোলিটানিয়ায় থাকে তারা নির্বাচিত করল তাদের জনপ্রতিনিধিদের। কিন্তু সাইরেশিয়া এবং সেজানে নির্বাচিত শাসকরা ঐ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিতদের গুরুত্বকে খর্ব করে দিয়ে ঢুকে পড়ল। কারণ এভাবেই নাকি একমাত্র লিবিয়ার সমস্ত জায়গা থেকে প্রতিনিধিত্ব সম্ভব। আর এটাকেই সাম্রাজ্যবাদী চক্র গণতান্ত্রিক আখ্যা দিল। এবার নাকি লিবিয়ার স্বাধীনতার পথে আর কোনও বাধা থাকল না এবং সংবিধানিকভাবে সংযুক্ত লিবিয়ার আমির হলেন ইদ্রিস আল সেনসুই।

রাজা ইদ্রিস জর্ডন ও মরক্কোর মতো বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে চলতেন। এই রাজাকে সরিয়ে ১৯৬৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর একটি রক্তপাতহীন সেনা অভ্যুত্থানে কর্নেল গদ্দাফি ক্ষমতায় এলেন, দেশের নাম হল 'লিবিয়ান আরব রিপাবলিক'। মিশর, ইরাক স্বীকৃতি দিল এই নতুন সরকারকে। আরব জাতীয়তাবাদের সমর্থক লিবিয়ার হাজার হাজার মানুষও সেদিন এই সরকারের সমর্থনে রাস্তায় নামে। ইজরায়েল, ব্রিটিশ, মার্কিন সরকার ঘেঁষা ইদ্রিসের পতনের সমর্থনের মধ্যে সাধারণ মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়।

ক্ষমতায় এসেই লিবিয়ার ব্যাঙ্ক এবং তৈল সম্পদের জাতীয়করণ করেন গদ্দাফি। ব্রিটিশ ও মার্কিন তেল কোম্পানিগুলিকে দেশ থেকে চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ হয় মদ। দেশের মানুষের জাতীয়তাবাদী আবেগ গদ্দাফিকে এই কাজে সমর্থন জানায় সম্পূর্ণভাবে। গদ্দাফির প্রতি জনসমর্থন বাড়তে থাকে। প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য জনগণের কমিটি গঠিত হয়। বার্ষিক জনকংগ্রেসে কমিটিগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখা হত। সেই সময় গদ্দাফিশাসিত লিবিয়ায় শিশুমৃত্যুর হার বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল বলে সংবাদে প্রকাশ। এখানে নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হত। আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে লিবিয়াতেই সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি। তেল বিক্রির অর্থের একটা বিরাট অংশ সরকার খরচ করেছে দেশের পরিষেবা খাতে।

লিবিয়ার অর্থনীতি অবশ্যই পুঁজিবাদী। গদ্দাফি আসলে লিবিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব ও কব্জার বাইরে স্বাধীন ও শক্তিশালী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা যাতে শক্তি পায়, সে জন্য সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁকে সহায়তা দিয়েছে, তিনিও তা নিয়েছেন।

আফ্রিকার নানা দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে গদ্দাফির লিবিয়া সমর্থন জোগায়। আফ্রিকান ইউনিয়ন গঠনে গদ্দাফির মূল ভূমিকা ছিল। নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস যখন মুক্তি সংগ্রাম করছিল, তখন তাদের অর্থসাহায্যের ক্ষেত্রেও লিবিয়া ছিল সর্বাগ্রে। প্যালেস্তাইন নেতা ইয়াসের আরাফত 'অসলো' চুক্তি স্বাক্ষর করার আগে পর্যন্ত প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)-এর সবচেয়ে বড় সমর্থক এবং অর্থসাহায্যকারী দেশ ছিল গদ্দাফিশাসিত লিবিয়া। আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে বিশ্বে প্রথম গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে লিবিয়া। এমনকী আয়ারল্যান্ড মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিলেন গদ্দাফি। ফলে, তিনি এবং তাঁর নেতৃত্বে লিবিয়া বিভিন্ন সময়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা নিয়েছে।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের দুঃখজনক পতনের পর গদ্দাফির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সুরও কিছুটা নরম হয়ে যায়। দেশের তেল ব্যবসা থেকে একসময় যাদের সটান বিদায় দিয়েছিলেন গদ্দাফি, একে একে সেই সমস্ত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সাথে তখন তিনি সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান। বুশ জমানায় ২০০৩-এর 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র জিগিরে বিপদ বুঝেই হয়ত গদ্দাফি তার সাথী হয়ে গিয়েছিলেন। ২০০৮-এ তৎকালীন বিদেশ সচিব কন্ডোলিজা রাইস গদ্দাফির আতিথ্য গ্রহণ করেন। যখন গদ্দাফিকে সমর্থন করলে আমেরিকা এবং তার দোসরদের লাভ ছিল, তখন তারা দু-হাত তুলে তাঁকে সমর্থন করেছে। গদ্দাফিও হয়ত ভেবেছিলেন, আমেরিকার সাথে সুসম্পর্ক রেখে চললে তিনি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাবেন। কিন্তু তা যে হয় না, প্রাণের মূল্যে গদ্দাফি তা প্রমাণ করে গেলেন।

নদীয়ায় কে কে এম এস-এর ডাকে
পথ অবরোধ

নদীয়া জেলার দেবগ্রামে ২ নভেম্বর এ আই কে কে এম এস-এর কৃষকরা ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন এবং দেবগ্রামে বি ডি ও-কে ডেপুটেশন দেন। তাঁরা দাবি করেন —

১। সারের ব্যাপক কালোবাজারি বন্ধ করতে কালোবাজারিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং সস্তাদরে সার ও বীজ সরবরাহ করতে হবে, ২। কৃষককে পাটের দাম কুইন্টাল প্রতি পাঁচ হাজার টাকা ও ধানের দাম পনেরশো টাকা দিতে হবে, ৩। জে সি আই-কে সরাসরি চাষির কাছ থেকে পাট কিনতে হবে ও সমস্ত ফসলের ন্যায্য দাম দিতে হবে। ৪। জবকার্ডধারী মজুরদের ২০০ দিনের কাজ ও ২০০ টাকা মজুরি দিতে হবে, ৫। ৬০ বছর বয়স থেকে কৃষককে ন্যূনতম তিন হাজার টাকা পেনশন দিতে হবে, ৬। কৃষকদের অবিলম্বে কৃষাণ ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে, ৭। জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনতে হবে।

হাবড়ায় চাষিদের পথ অবরোধ

সরকার একদিকে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার কথা বলছে অন্যদিকে সার কালবাজারিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। পরিণামে চাষ বন্ধ হওয়ার জোগাড়। বছরের পর চাষিরা ফসলের উপযুক্ত দাম না পাওয়া পর্যন্ত শত শত চাষিরা এ আই কে কে এম এস-এর ডাকে ২ নভেম্বর হাবড়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চাষের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ও ব্যাপক কালবাজারির প্রতিবাদ জানায়। এবং দাবিগুলি নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ২২ নভেম্বর কলকাতায় গণআইন অমান্য কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

সারের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির নমুনা

	সারের বর্তমান দাম (কেজি প্রতি)	এক বছর আগের দাম (কেজি প্রতি)
পটাশ	৪.৪৫	১১.৫৭
ডিএপি	৯.৩৫	১৮.৬১
১০ঃ২৬ঃ২৬	৭.১৯	১৬.৪১
২০ঃ২০ঃ০ঃ১৩	৭.৬৩	১৫.২১
ফসফেট	৩.৬২	৪.২০

হাওড়া জেলা যুব সম্মেলন

সকল বেকারের কাজের দাবিতে এবং মদ-জুয়া-সাট্টা, অনলাইন লটারি, সাম্প্রদায়িকতা, এসএসসি পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে বিএড ডিগ্রী ও স্নাতক স্তরে ৫০ শতাংশ আবশ্যিক করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এ আই ডি ওয়াই ও-র দ্বিতীয় হাওড়া জেলা যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৬ অক্টোবর বাগনান বয়েজ হাইস্কুলে। সম্মেলনের শুরুতে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জ্ঞানতোষ প্রামাণিক, কমরেড চিত্ত পড়্যা, এস ইউ সি আই (সি)-র হাওড়া জেলা সম্পাদক কমরেড দেবাশিষ রায় এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র জেলা নেতৃবৃন্দ।

শহিদদের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালনের পর মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড নিখিল বেরা। পরে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন কমরেড প্রদীপ মণ্ডল। সম্মেলনে অপসংস্কৃতি ও মিটিং মিছিল, বনধ ধর্মঘট নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এবং এসএসসি-তে বিএড ডিগ্রি ও স্নাতক স্তরে ৫০ শতাংশ আবশ্যিক করার বিরুদ্ধে তিনটি প্রস্তাব পাঠ করা হয়। মূল প্রস্তাব, সাংগঠনিক রিপোর্ট ও তিনটি প্রস্তাব সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে মূল বক্তা কমরেড জ্ঞানতোষ প্রামাণিক আবেগের সাথে যুব সমাজের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। সবশেষে কমরেড প্রদীপ মণ্ডলকে সভাপতি, কমরেড নিখির বেরাকে সম্পাদক ও কমরেড রমেশ মাইতিকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৫ জনের এ আই ডি ওয়াই ও জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মুড়াগাছায় ছাত্র সম্মেলন

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের স্মৃতি বিজড়িত নদীয়ার মুড়াগাছায় ৩১অক্টোবর এ আই ডি এস ও'র প্রথম আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা, ফি-বৃদ্ধি প্রভৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরিন্দম রায়। রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও নদীয়া জেলা সম্পাদক কমরেড কামালউদ্দিন ও সভাপতি কমরেড মসিকুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলন থেকে কমরেড সুখেন পাত্রকে সভাপতি, কিশোর সরকারকে সহসভাপতি, চিরঞ্জিৎ বিশ্বাসকে সম্পাদক করে ১৬ জনের কমিটি গঠিত হয়।

‘মহান গণতন্ত্রে’ মন্ত্রীরা হচ্ছেন কোটিপতি, সাধারণ মানুষ গরিব

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের শতকরা ৭৭ জনই কোটিপতি। এটা আমেরিকার মন্ত্রীদের তথ্য নয়, ভারতের ‘মহান গণতন্ত্রে’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যদের তথ্য। স্বাভাবিক কারণে, মুদ্রাস্ফীতি বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির ক্ষমতাই নেই এঁদের সংসার চালাবার বাজেটে এতটুকুও প্রভাব ফেলার। বাজারে সবজির দাম ৩০-৪০ টাকা কেজি বা তার ঊর্ধ্বে হওয়ায় ‘নুন আনতে পান্তা ফুরনো’ গরিব মানুষকে, চাষি-মজুর-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষকে কী ভয়াবহ যন্ত্রণায় পড়তে হচ্ছে, কিংবা বেকারির জ্বালায় বা কাজ হারানোর যন্ত্রণায় সাধারণ মানুষের কী করুণ পরিণতি ঘটছে, তা ওঁরা কী করে অনুভব করবেন! ওঁদের সম্পদ তো কখনওই হ্রাস পায় না, কেবলই বেড়ে চলে এবং তা দ্রুত গতিতে। আবার, ওঁরাই পার্লামেন্টে বসে ১২০ কোটিরও বেশি ভারতবাসীর ভাগ্য নির্ধারণে আইন প্রণয়ন করেন।

প্রকাশ্যে দেওয়া হিসাব থেকে সবচেয়ে ধনী মন্ত্রীদের যে তালিকা পাওয়া যায়, তার মধ্যে সেরা তিনজন মন্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ এবং তা কেমন দ্রুতগতিতে বাড়ছে, তার একটা ছবি দেখা যেতে পারে। ভারি শিল্প দফতরের মন্ত্রী প্রফুল্ল প্যাটেল (এন সি পি) ১২২ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। দু’বছর আগে ২০০৯ সালে তাঁর ছিল ৭৯ কোটি ৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। দু’বছরে বেড়েছে ৪২ কোটি ২ লক্ষ টাকা। তথ্য ও সম্প্রচার দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জগথ্রাকসাকান (ডি এম কে)-এর ২০০৯ সালের ৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকার সম্পদ বেড়ে হয়েছে ৭০ কোটি টাকার সম্পদ। দু’বছরে বৃদ্ধি ৬৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। নগর উন্নয়ন মন্ত্রী কমলনাথ (কংগ্রেস)-এর সম্পদ ২০০৯-এর ১৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১১ সালে হয়েছে ৪১ কোটি টাকা। দু’বছরে বৃদ্ধি ২৭ কোটি টাকা।

মন্ত্রীদের কী করে এই হারে সম্পদ বৃদ্ধি ঘটে? কোথা থেকে আসে এত সম্পদ?

প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী প্রায়ই ঘোষণা করেন, ভারত মজবুত অর্থনৈতিক ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার ‘ইকনমিক গ্রোথ’ চমৎকার। শিল্পপতি, বৃহৎ ব্যবসাদার, জোতদার, মজুতদার, ফাটকাবাজদের বিপুল মুনাফার পাহাড়ে এবং মন্ত্রীসভার ৭৭ শতাংশ সদস্যের বিপুল সম্পদবৃদ্ধির মধ্যেই শুধু এই চমৎকার ‘গ্রোথ’-এর প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু, এর একেবারে বিপরীত চিত্র সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনে। দেশের এই বিপুল সংখ্যক মানুষ নিত্যপণ্যের দামবৃদ্ধির যন্ত্রণায় ছটফট করে, বাধ্য হয়ে খাদ্যের পরিমাণ ও গুণমান ক্রমাগত কমাতে থাকে, যা হোক কিছু গিলে নিয়ে পেটটা ভরানোর চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়। তাদের জীবনসঙ্গী হয় — অর্ধাহার, অনাহার, বেকারি, অপুষ্টি, অপুষ্টিজনিত কারণে রোগগ্রস্ত হওয়া, রোগে চিকিৎসা না পাওয়া, ধুঁকতে ধুঁকতে মরা, শিক্ষার ব্যয় সংকুলান না হওয়া, নিত্যপণ্য ও ওষুধের বেপরোয়া মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, শ্রমিকের কাজ হারানো বা তার ন্যায্য মজুরিটুকু না পাওয়া।

এগুলির সুরাহার আশ্বাসবাণী দিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীরা, কিছু কিছু প্রলেপ — প্রকল্পের কথা ঘোষণাও করেন। কিন্তু, শিল্পপতিদের ও রফতানিকারকদের জন্য বিপুল আর্থিক ছাড় ও নানা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা নিয়মিত বরাদ্দ করে থাকেন। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ও এমপিদের জন্য বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা ঢেলে দেন। দেশের জনসংখ্যার এই সামান্য অংশ তাই ক্রমাগত ফুলে ফেঁপে ওঠে। বিশ্বের সর্বোচ্চ ধনীদের তালিকায় ভারতীয় শিল্পপতিদের নাম যুক্ত হয়। আর, আমাদের দেশ হয়ে ওঠে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ গরিব মানুষের ঠিকানা। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী, ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪১.৬ শতাংশ মানুষ আন্তর্জাতিক দারিদ্রসীমারেখার নিচে বাস করে। স্কুল-কলেজে এদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া কিংবা ওষুধ কিনে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া দূরের কথা, দু’বেলা পেট ভরা খাবারও জোটে না। অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট — দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষের দৈনিক খরচ করার সামর্থ্য ২০ টাকারও নিচে এবং এদের একটা বিরাট অংশের দৈনিক আয় ৯ টাকারও কম। ভারতের প্ল্যানিং কমিশন নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী তেণ্ডুলকর কমিটির যে রিপোর্ট গ্রহণ করেছে, তাতেও বলা হচ্ছে, দেশের ৩৭ শতাংশ মানুষ রয়েছে দারিদ্রসীমার নিচে। ২০১১-র গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স-এর রিপোর্ট বলছে, বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুধার্ত দেশগুলির মধ্যে ভারত ১৫তম স্থানে। দেশের পাঁচ বছর বয়সী শতকরা ৪৯টি শিশু রক্তাল্পতায় ভুগছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর কারণ অপুষ্টি। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে মা ভুগছেন অপুষ্টিতে ও রক্তাল্পতায়। পরিণামে শিশু জন্মাচ্ছে অপুষ্টি নিয়ে, কম ওজন নিয়ে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছর দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী ২১ লক্ষ শিশু অপুষ্টির শিকার হয়ে মারা যাচ্ছে।

নেতা-মন্ত্রীদের বক্তৃতায় স্থান পায় এক ভারত, এক জাতির কথা। বাস্তবের মাটিতে দুই ভারত, দুই জাতি। একদিকে অর্থ-সম্পদে ফেঁপে ওঠা মুষ্টিমেয় অর্থশালীদের ভারত, অন্যদিকে ধুঁকতে থাকা বিপুল চাষি-মজুর-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের ভারত। ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন যে কথা আমেরিকার শাসন ও অর্থনীতি নিয়ে বলছে, একই কথা ভারতের ক্ষেত্রেও সত্য। তবুও নাকি বলতে হবে, ভারতবর্ষ একটি মহান গণতান্ত্রিক দেশ, এখানে গণতন্ত্র নাকি মজবুত!

চিকিৎসার খরচ জোগাতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে মানুষ

পরিবারের অসুস্থ সদস্যটির চিকিৎসা করাতে গিয়ে ক্রমেই আরও বেশি মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছেন। সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ‘হু’-র একটি রিপোর্টে ভারতের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা প্রকাশিত হয়েছে।

‘হু’-র রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রায় ৭০ শতাংশ ভারতবাসী চিকিৎসা ও ওষুধ কেনার পিছনে আয়ের সমস্ত অর্থ ঢেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, হু-র রিপোর্টে আরও বেরিয়ে এসেছে যে, অতি শীঘ্র, চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে আরও ৩.২ শতাংশ কপর্দকশূন্য ভারতীয়ের ঠাঁই হবে দারিদ্রসীমার নিচে। পরিকল্পনা কমিশন এ সংক্রান্ত যে তথ্য দিয়েছে তা আরও ভয়ানক। তারা বলেছে, এ দেশে প্রতি বছর প্রায় ৪ কোটি মানুষ চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যান।

কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৪ সালে অভাবের কারণে ভারতের গ্রামগুলির প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ রোগের চিকিৎসা করাতে পারেননি। ঐ বছরেই শহরের দরিদ্র ২০ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা করাতে না পেরে রোগের জ্বালা নীরবে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছেন। চিকিৎসার অভাবে গোটা দেশে কত মানুষের মৃত্যু হয়, তার কোনও হিসাব এখনও পর্যন্ত পাওয়া না গেলেও, এ সংখ্যা যে যথেষ্ট বেশি, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সরকারি হিসাবে উঠে আসা এইসব ভয়াবহ তথ্য যে বাস্তব পরিস্থিতির এক খণ্ডচিত্র মাত্র, ভুক্তভোগী মানুষ তা জানেন। বস্তুত আজ এ দেশের বহু সংখ্যক মানুষই চিকিৎসা করাতে গিয়ে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ খরচ করে ফেলার পরে জমি-বাড়ির মতো স্থাবর সম্পত্তি, এমনকী ঘরের ঘটিবাটি পর্যন্ত বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। বহু মানুষ ঋণের জালে আপাদমস্তক জড়িয়ে যাচ্ছেন, যা জীবদ্দশায় পরিশোধ করার ক্ষমতা তাঁদের থাকছে না। পরিকল্পনা কমিশন এ সংক্রান্ত একটি তথ্যে জানিয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া গ্রামীণ মানুষের ৪৭ শতাংশই চিকিৎসার খরচ চালাতে বিপুল ঋণ করতে, কিংবা সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। শহরের ক্ষেত্রে এই অবস্থায় পড়েছেন ৩১ শতাংশ মানুষ। বস্তুত অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অসুস্থ পরিজনের চিকিৎসার খরচে জেরবার, পথে বসতে চলা নিরুপায় মানুষ অনেক সময় রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করছেন। বিশেষত ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের কবলে পড়া রোগীর, ধার দেনায় জর্জরিত সর্বস্বান্ত হতে চলা পরিবার-পরিজনের এই ধরনের চিন্তার শিকার হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকছে না। প্রিয়জনকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণায় শোক করবারও যেন উপায় থাকছে না পরিবারের অন্য মানুষগুলির, তাদের তখন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ার আতঙ্ক।

ক্ষমতার রাজনীতি করা সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা অবিরাম ঢাক পেটাচ্ছে যে দেশের উন্নয়নের, সেই ভারতেরই সাধারণ মানুষের এই দৈন্যদশা! দেশের জনসাধারণের এই চরম দুরবস্থার কথা নেতাদের কানে পৌঁছায় না, এমন নয়। কিন্তু তাঁরা চূড়ান্ত নির্বিকার। তাঁদের মন-প্রাণ নিবেদিত রয়েছে পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থচিন্তায়। সেই কারণেই দেশের মানুষের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি হাসপাতালগুলিকে ধীরে ধীরে বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে সরকারগুলি। স্বাস্থ্যখাতে ক্রমাগত কমিয়ে দিচ্ছে বাজেট বরাদ্দ। পুঁজিমালিকদের বিপুল করছাড় ও আর্থিক অনুদান অবাধে দিতে পারলেও সাধারণ মানুষের জন্য খরচ করার মতো অর্থ নাকি তাদের ভাঁড়ারে নেই। তাই রাজ্যে রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে দেওয়া ওষুধের সংখ্যা ক্রমশই কমিয়ে দিচ্ছে নির্মম এইসব সরকার, দলের পতাকার রঙ তাদের যাই হোক না কেন। এ সংক্রান্ত কিছু তথ্যও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন মহারাষ্ট্র সরকার গত বছর ওষুধ কেনার জন্য স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের মাত্র ৫.২ শতাংশ খরচ করেছে। অথচ দশ বছর আগে সে রাজ্যে এই খরচের পরিমাণ ছিল স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়ের ১১.৩ শতাংশ। তামিলনাড়ু সরকার ২০১০ সালে ওষুধ কিনতে স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়ের মাত্র ১২.২ শতাংশ খরচ করেছে। ২০০১ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৫.৩ শতাংশ। কেরালা রাজ্যটি গত বছর ওষুধ কিনতে গোটা দেশের নিরিখে সবচেয়ে বেশি খরচ করেছে — স্বাস্থ্য খাতে, মোট ব্যয়ের ১২.৫ শতাংশ। অথচ ২০০১ সালে এই রাজ্যটিই এই খাতে ব্যয় করেছিল স্বাস্থ্য বরাদ্দের ১৭ শতাংশ। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০০১-০২ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ওষুধ কেনার জন্য খরচ করেছে স্বাস্থ্যখাতে মোট খরচের মাত্র ৪.৩৯ শতাংশ। রাজস্থান, হরিয়ানা, কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশ সহ প্রায় সমস্ত রাজ্যেরই এক চিত্র।

এভাবেই পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থবাহী এ দেশের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা ক্রমেই আরও বাড়িয়ে তুলছে। জনকল্যাণের মোহিনী বুলির আড়ালে মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার প্রাথমিক অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিচ্ছে তারা।

(সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২-১১-১১)

দিল্লিতে শ্রমিক কনভেনশন

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা তীব্র বাজার সংকট থেকে বাঁচতে ১৯৯১ সাল থেকে উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ, বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের গালভরা কথার আড়ালে সংকটের সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে। বিশ্ব জুড়ে কোপ পড়েছে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তায়। বিশেষ করে ২০০৮ সালে অর্থনৈতিক মহামন্দার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ব জুড়ে কাজ হারিয়েছে ৩ কোটি শ্রমিক। বেকার সংখ্যা ২০ কোটির বেশি এবং তা ক্রমবর্ধমান। প্রতিবাদে-প্রতিরোধে খোদ আমেরিকা সহ দেশে দেশে আন্দোলনের ঝড় উঠেছে। গ্রিস যথার্থই গণআন্দোলনের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ভারতেও কংগ্রেসের হাত ধরে যে উদারিকরণ শুরু হয়েছিল, তার দাপটে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। কেড়ে নেওয়া হয়েছে অর্জিত অধিকার। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এই নির্মম আক্রমণের প্রতিবাদে ও প্রতিকারের সন্ধানে দিল্লির গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন হলে ১২ অক্টোবর এ আই ইউ টি ইউ সি দিল্লি রাজ্য কমিটির ডাকে এক শ্রমিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনশনে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি দীপক কুমার শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থার উপরে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। সংগঠনের দিল্লি কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কমরেড ম্যানেজার চৌরাশিয়া আলোচনার জন্য ‘ডিসকাসন লেটার’ উপস্থিত সকলের সামনে রাখেন। প্রতিনিধিরা তার উপর আলোচনা করেন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড এ কে মজুমদার। প্রধান বক্তা এ আই ইউ টি ইউ সি-র সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিনহা দেশে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও পেনশনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। কীভাবে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ইউনিয়ন গঠন ও রেজিস্ট্রেশনে বাধা দেওয়া হচ্ছে, অর্জিত বহু সুযোগ সুবিধা ছাঁটাই করা হচ্ছে, ছুটি কমানো হচ্ছে, মিছিল-মিটিং-ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পে-কমিশন ১০ লক্ষ পদের অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। কেন আজ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এই পথে যাচ্ছে সে সম্পর্কেও কমরেড সিনহা তাঁর বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড হরিশ ত্যাগীও বক্তব্য রাখেন। দিল্লি সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, স্বশাসিত সংস্থা, অসংগঠিত শ্রমিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং বহু ইউনিয়ন থেকে শ্রমিক-কর্মচারীরা কনভেনশনে অংশ নেন। কনভেনশন থেকে সংগঠিত-দীর্ঘস্থায়ী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেওয়া হয়।

● ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বন্ধ ● নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে

সর্বভারতীয় মহিলা কনভেনশন

২৯-৩০ নভেম্বর, ২০১১, রবীন্দ্র কলাক্ষেত্র, বাঙ্গালোর

উদ্বোধক ঃ জাস্টিস এম এন ভেঙ্কটচালাইয়া **(প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট)**
বিশেষ অতিথিবৃন্দ ঃ জাস্টিস বি এন শ্রীকৃষ্ণ **(সুপ্রিম কোর্ট),** জাস্টিস সুরেশ হোসবেট **(সুপ্রিম কোর্ট)** জাস্টিস মলয় সেনগুপ্ত **(প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, সিকিম হাইকোর্ট),** জাস্টিস সুভাষণা রেড্ডি **(প্রাক্তন বিচারপতি, মাদ্রাজ),** অধ্যাপক গোকুলানন্দ দাস **(প্রাক্তন উপাচার্য উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়)**অধ্যাপক ডেইজি নারায়ণ **(পাটনা ইউনিভার্সিটি),** মল্লিকা সারাভাই **(প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী),** গিরিশ কাসারাভাল্লী **(বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক),** শতরূপা সান্যাল **(বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক)**

সারের অগ্নিমূল্য প্রতিরোধ, ধান-পাট-আলু সহ, সমস্ত কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম,
জবকার্ডহোল্ডারদের ২০০ দিন কাজ ও ২০০ টাকা মজুরির দাবিতে

২২ নভেম্বর এ আই কে কে এম এস’র ডাকে

কৃষক-মজুরদের আইনঅমান্য

জমায়েত ঃ কলেজ স্কোয়ার, বেলা ১টা

সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

জলপাইগুড়িতে পাট পুড়িয়ে চাষিদের বিক্ষোভ

অনেক অভাব অনটনের মধ্যেও পূজার পর পাটের দাম পাওয়ার আশায় কিছু পাট ধরে রেখেছিলেন জলপাইগুড়ির কৃষকরা। কিন্তু পাট বিক্রি করতে না পেরে ২৮ অক্টোবর অবিক্রিত রাজগঞ্জ হাটে পাট পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। একজন কৃষক বলেন, দেনা করে সংসার চালিয়েছি, ছোট ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় দিতে পারিনি। রাজ্য সরকারের ঘোষণা শুনে অনেক আশা করে পাট নিয়ে হাটে এসেছি, কিন্তু বিক্রি করতে পারলাম না। তাই অবিক্রিত পাট জ্বালিয়ে দিলাম। এনামুল হক নাসিরুদ্দিন, যতীন রায়, রথীন বিশ্বাস সব বহু চাষি তাঁদের দুঃখের কথা তুলে ধরেন।

ঘটনাস্থলে পাটচাষি সংগ্রাম কমিটির জেলা সম্পাদক হরিভক্ত সর্দার ছুটে আসেন। পাটচাষিরা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি মিলিতভাবে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর পাটচাষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পোস্ট অফিস মোড়ে একটি বিক্ষোভ সভা করেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন হরিভক্ত সর্দার, উদয় রায়, জীবন সরকার প্রমুখ। তাঁরা পাটের দাম কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা কুইন্টাল করার দাবি জানান।

বহরমপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পাট পোড়ালো চাষিরা

১ নভেম্বর বহরমপুরে ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পাট পোড়ালো জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা চাষিরা। অবরোধস্থলে এ আই কে কে এম এস-র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক গোলাম মহবুব বিশ্বাস বলেন, মুর্শিদাবাদে চাষিরা পাটের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। যেখানে ১ কুইন্টাল পাট চাষে খরচ প্রায় ৩,৫০০ টাকা, সেখানে চাষিরা পাচ্ছেন ১৭০০ টাকা। এমনকী সরকারি সংস্থা জে সি আই সরাসরি চাষির কাছে থেকে না কিনে ফড়ে বা দালালদের কাছ থেকে পাট কিনছে।

পাশাপাশি রবিশস্য বপনের সময়ে চাষিরা নির্ধারিত দামে সার বীজ পাচ্ছেন না। সরকারি নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার ফলে দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাপক কালোবাজারি চলছে। যেখানে ইউরিয়ার সরকারি দাম ৫.৭৮ টাকা প্রতি কেজি সেখানে ৮-৯ টাকা কেজি দামে চাষিদের কিনতে হচ্ছে। ডি এ পি যেখানে ১৮.৫০ টাকা সেখানে কালোবাজারে ২২-২৫ টাকায় চাষিরা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। অবিলম্বে কালোবাজারি বন্ধ করে ন্যায্য দামে চাষিরা সারের দাবি করেন। এছাড়া ধানের সহায়ক মূল্য ১৫০০ টাকা কুইন্টাল করা এবং অতিবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, সমস্ত চাষিদের শস্যবিমা ও কিষাণ ক্রেডিটকার্ড প্রদান, সরকারিভাবে বীজ সরবরাহ, জি এম বীজ বাতিল, প্রতি ব্লকে হিমঘর নির্মাণ, করমুক্ত ডিজেল ও সস্তায় বিদ্যুৎ প্রভৃতি ৭ দফা দাবিতে চাষিদের একটি মিছিল প্রথমে ডি ডি এ অফিসে বিক্ষোভ দেখায় তারপর গির্জার মোড়ে পথ অবরোধ করে। সেখানে চাষিরা পাটের ন্যায্য দাম না পাওয়ার ক্ষোভে পাটের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেন, তারপর আবার ডি ডি এ অফিসে ঘেরাও-বিক্ষোভ চলে প্রায় ২ ঘন্টা। ডি ডি এ, আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে মাইকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, ৪ নভেম্বরের মধ্যে যে এলাকার চাষিরা সার নিতে চান সেখানকার স্থানীয় ডিলারের নাম এবং প্রয়োজনীয় সারের তালিকা জমা দিলে তিনি সারের ব্যবস্থা করবেন। অন্যান্য দাবিগুলির বিষয়েও তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি ধনঞ্জয় ঘোষ. সামিরুদ্দিন, ভরত দে প্রমুখ।

একই দাবিতে ৩১ অক্টোবর হরিহরপাড়ায় কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে দিনমজুররা রাস্তা অবরোধ করেন। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক গোলাম মহবুব বিশ্বাস, লালন সেখ, ফয়সাল বেগ, বলরাম মণ্ডল প্রমুখ। বিভিন্ন এলাকায় চাষি বাঁচাও কমিটি গঠন করে ২২ নভেম্বর কলকাতায় আইন অমান্যে অংশগ্রহণের জন্য সকল চাষিকে আহ্বান জানান সংগঠনের অন্যতম নেতা দিলীপ দাস।

আসামে স্কুল ইউনিয়নে জয়ী এ আই ডি এস ও

আসামের লখিমপুর জেলায় হরিমতি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে টানটান উত্তেজনার মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সহ ৬টি পদে ছাত্রস্বার্থবিরোধী বিভেদকামী দু'টি ছাত্র সংগঠনকে হারিয়ে এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এ এ এস ইউ এবং এন এস ইউ আই নামক দু'টি ছাত্র সংগঠনের প্রচণ্ড ভীতি প্রদর্শন ও বিপুল টাকার প্রলোভনের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে এ আই ডি এস ও-র পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ছাত্রস্বার্থ বিরোধী শিক্ষা নীতির পক্ষে কাজ করছে ঐ দু'টি ছাত্র সংগঠন। পাশাপাশি এও দেখেছেন যে, সর্বনাশা শিক্ষানীতি ও শিক্ষার ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একমাত্র এ আই ডি এস ও দীর্ঘকাল লড়াই চালিয়ে আসছে। স্বাভাবিক কারণেই সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র বিপুল জয়ে উল্লসিত সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা।

পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে ছাত্রবিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার অধিকার আইনের নাম করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এই সিদ্ধান্ত শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের পথকেই প্রশস্ত করবে। পাশাপাশি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে ছাত্র, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের স্বাধিকার ও গণতন্ত্রহরণকারী কালা অর্ডিন্যান্স পাশ করানো হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ৪ নভেম্বর রাজ্য জুড়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করার আহ্বান জানায় এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। এরই অঙ্গ হিসাবে এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল আসে এসপ্ল্যানেডে। সেখানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার কালা সার্কুলারের প্রতীকে অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই।

এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুরের ডি আই অফিসে ও জেলার কালেকটরেটের মোড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর ও রায়দিঘিতে, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড সহ জলপাইগুড়ির কদমতলা মোড়ে, শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, ঔরঙ্গাবাদ, কোচবিহারের হলদিবাড়ি, মাথাভাঙা, দিনহাটা ও কোচবিহার সদরে এবং নদীয়ার পলাশিতে উত্তর ২৪ পরগণা, বীরভূম, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ, পথ অবরোধ হয়।

এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে রাজ্যের সর্বত্র ছাত্র আন্দোলন চলবে বলে এ আই ডি এস ও নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

সাতমাইলে চাষিদের রাস্তা অবরোধ

কোচবিহার

জৈব রাসায়নিক সার সহ সমস্ত রকম অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও অর্থকরী ফসল আলু সরকারি উদ্যোগে ১২০০ টাকা কুইন্টাল দরে ক্রয়, আগামী আলু ও বোরো ধানের মরশুমে দ্রুত কৃষি ঋণপ্রদান, নামমাত্র মূল্যে সার-বীজ-কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ব্লক মারফত সরাসরি চাষিদের সরবরাহ, ইত্যাদি দাবিতে ৩১ অক্টোবর কোচবিহার মাথাভাঙা রোডের সাতমাইলে পথ অবরোধ করে কোচবিহার জেলা আলু-পাট-ধান চাষি সংগ্রাম কমিটি এবং সারা ভারত কৃষক খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে সাতমাইল এলাকার চাষিরা। সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি চলে। সংগ্রাম কমিটির নেতা উপেন বর্মন জানান বর্তমানে আলু চাষিরা হিমঘর থেকে মাত্র ২০০ টাকা কুইন্টাল দরে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। আলুচাষিদের এই দুর্দিনে কৃষকদের পাশে থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে অনুরোধ করেন তিনি। এ আই কে কে এম এস-এর নেতা ও বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির জেলা কমিটির সদস্য জালাল আমেদ বলেন, যেভাবে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে তাতে আগামী মরশুমে বোরোচাষিরা সেচের জল ব্যবহার করতে পারবে না বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে ৯ নভেম্বর রাজ্য ভিত্তিক আন্দোলনে কলকাতার বিক্ষোভ সমাবেশে সাতমাইলের চাষিরাও অংশগ্রহণ করবেন বলে তিনি জানান। সংগ্রাম কমিটির জেলা নেতা নৃপেন কার্যী জানিয়েছেন, আগামী ১০ নভেম্বর জেলার সমস্ত চাষিদের নিয়ে কৃষিঋণ মকুব সহ উপরোক্ত দাবি সমূহ পূরণের দাবিতে জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত হবে।

পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার দেশের তেল কোম্পানিগুলিকে পেট্রোলের দাম পুনরায় বৃদ্ধি করার অনুমতি দেওয়ার এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কেন্দ্রীয় কমিটি দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তার অঙ্গ হিসাবে ৪ নভেম্বর আগরতলার বটতলাতে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেডস সঞ্জয় চৌধুরী ও সুব্রত চক্রবর্তী। তাঁরা তেল কোম্পানিগুলির মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের প্রতি সরকারি তোষণনীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কেরালায় রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির

২৯-৩১ অক্টোবর কেরালার পাঠানামথিট্টা জেলার আদুরে রাজ্য শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীও দু'টি সেশনে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সি কে লুকোস ও অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।